KRISHAKA.

BY

Kamini Kumar Chakervarti

EDITOR CHARUVARTA.

কৃষক।

চারুবার্ত্তা সম্পাদক

শ্রীকামিনী কুমার চক্রবর্ত্তী

প্রণীত।

লোকেস্মিন্ জীবনং পাতুং

নেশঃ কোপি কৃষিংবিনা।

সহর শেরপুর

চারুযন্ত্রে—শ্রীতমিজ উদ্দিন আহাম্মদ

দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০। সন।

মূল্য ।/০ পাঁচ আনা মাত্র।

ভূমিকা।

পূর্ব্বে বাণিজ্যের পরই কৃষি কার্য্যের সমাদর ছিল। রাজা মহারাজা হইতে দীন দরিদ্র,—মুনি ঋষি হইতে ভেকধারী বৈষ্ণব সকলেই পূর্ব্বকালে কৃষি ব্যবসায়ের সমাদর করিতেন—সমাদর করিতেন, তজ্জন্য তৎকালীয় লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা খুব কমই ছিল। দেশের অধিকাংশ লোক পুরাকালে কৃষি ব্যবসায় করিতেন। বর্ত্তমান শিক্ষায় লোক চাকরী বা দাসত্ব ব্যবসায়ী হইয়া পড়িয়াছেন। নিম্নশিক্ষায় কৃষক সংখ্যা আবার দিন দিন কমিতেছে—কেন কমিতেছে? প্রশ্নের উত্তর জটিল নহে। গবেষণা করিলে স্বতঃই প্রতীতি হইবে যে, কৃষি ব্যবসায়ের প্রতি এখন আর লোকের রুচি নাই। শুদ্ধ রুচি নাই, এমত নহে, কৃষি ব্যবসায়ী হইলে সম্মানের হানী হয় বলিয়াও অনেকের ধারণা আছে। বাস্তবিকও কৃষি ব্যবসায়ীগণ সমাজ সমীপে সাধারণ ভাবে আছে। এই জন্য বড়লোক—শিক্ষিত লোক দূরে থাকুক, মধ্যবিত্তশালী ও মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত লোকমাত্রেই সহজে কৃষি ব্যবসায় অবলম্বন করিতে চান না। দেশে প্রচুর কৃষিব্যবসায়ী থাকিলে লোকের দারিদ্র্য, কষ্ট, দুঃখ বোধহয় এতবৃদ্ধি হইত না।

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে পর্য্যন্ত কৃষিবিষয়ক গ্রন্থ অধিত না হইবে, সেই পর্য্যন্ত লোকের রুচি কৃষি বিষয়ে আকৃষ্ট হইবে না। এই জন্য নিম্ন শিক্ষার পাঠ্য মধ্যে অনেকে কৃষি বিষয়ক গ্রন্থ প্রবিষ্ট করাইতে ইচ্ছুক। কিন্তু কৃষিবিষয়ে বালকগণের উপযোগী ভালগ্রন্থ প্রচুর নাই। যে দুই তিনখান দৃষ্ট হয় তাহার মধ্যে কোন কোন খান পাশ্চাত্য কৃষি কথায় পূর্ণ। ঐরূপ গ্রন্থে

দেশীয় কৃষি এবং কৃষকের উন্নতির, আশা খুব কম। কোন কোন গ্রন্থ আবার দরিদ্র বালকগণের পক্ষে খরিদ করা কষ্টসাধ্য, এই জন্য "কৃষক" সাধারণের হস্তে সমর্পণ করিলাম।

নানা কারণে পাশ্চাত্য কৃষি পদ্ধতি বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের উপযোগী নহে। এই জন্য কৃষককে আমি দেশীয় ভাবে গঠিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি। আমি আজ ১৬ বৎসর যাবৎ জমিদারী বিভাগে কার্য্য করিতেছি। অধিকাংশ সময় প্রজা মণ্ডলির মধ্যে অবস্থান হেতু কৃষি সম্বন্ধে আমার যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে "কৃষক" তন্মূলে রচিত হইল।

বীজ ফশল পোকায় নষ্ট করে, ফশলের গাছে পোক লাগিয়া গাছকে নষ্ট করিয়া ফেলে, ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফশল হয় না ইত্যাদি বিষয়ে কৃষক শ্রেণীর বিশেষ কোন বিজ্ঞতা নাই। এই জন্য তাহার প্রতি বিধানের উপায় সকল বহু সন্ধান পূর্ব্বক গ্রন্থ মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছি।

হস্ত লিখিত অবস্থায় গ্রন্থের কলেবর কিছু বেশী ছিল, দরিদ্র বালক গণের ক্রয় সাধ্য করিবার জন্য সংক্ষেপ করিয়া গ্রন্থের কলেবর ছোট করা হইয়াছে। তাড়তাড়ি মুদ্রণ হেতু ভ্রম প্রমাদ থাকা অসম্ভব নহে।

গ্রন্থের ভাষা বালকগণের উপযোগিনী করিবার জন্য আমি যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। এক্ষণে কৃষকের প্রতি সাধারণের কৃপাদৃষ্টি দেখিলে আমি আমার শ্রম স্বার্থক জ্ঞান করিব।

শ্রীকামিনী কুমার চক্রবর্ত্তী।

কৃষক।

প্রথম অধ্যায়।

কৃষক ও কৃষিকার্য্য।

যাঁহাদিগের পরিশ্রমে সংসারের প্রয়োজনীয় কার্য্য নির্ব্বাহের উপযোগী বৃক্ষাদি উৎপন্ন হয় এবং যাঁহাদের শ্রমে ও যত্নে ঐ সব বৃক্ষাদির উন্নতি বিহিত হয়, তাঁহাদিগকে কৃষক কহে। কৃষক যে নিয়ম অনুসারে বৃক্ষের উৎপাদন ও উন্নতি বিহিত করে তাহার সাধারণ নাম কৃষিকার্য্য।

কৃষক শ্রেণী প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; উত্তম কৃষক ও সাধারণ কৃষক। যাঁহারা জল, বায়ু, তাপ ও আলোর প্রকৃতি সম্যক বিবেচনা করিয়া কৃষিকার্য্য করে তাহাদিগকে উত্তম কৃষক কহে। যাহারা জল বায়ু প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া সাধারণ অভ্যাস মতে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহাদের নাম সাধারণ কৃষক। আজ কাল এতদ্দেশে যে সব লোক কৃষিকার্য্য করে তাহার অধিকাংশই সাধারণ কৃষক। উত্তম কৃষক হইতে কিঞ্চিৎ লিখা পড়া জানার আবশ্যক করে। বিজ্ঞান শাস্ত্রে কথঞ্চিৎ অধিকার না থাকিলে উত্তম কৃষক পদ বাচ্য হওয়া যায় না। আমরা রাজার মুখাপেক্ষী।

রাজা যে কার্য্যে প্রবৃত্ত বা উৎসাহ দান না করেন, আমরা সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হই না, হইতে ইচ্ছাও করি না। দেশের শিক্ষিত-গণ এ ব্যবসায়ে পরাঙ্মুখ। এই জন্য আমরা এদেশ মধ্যে উত্তম কৃষক দেখিতে পাই না। এ বিষয়ে বর্ত্তমান রাজা হইতে হিন্দু রাজগণ অনেক পরিমাণে অগ্রসর ছিলেন। পৃথুরাজ তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। পৃথুরাজ কৃষিকার্য্যের প্রকৃষ্ট উন্নতি বিধান করিয়া ছিলেন এই জন্য আজিও বসুন্ধরা পৃথিবী নামে খ্যাত।

এতদ্দেশে কৃষি কার্য্যের প্রধান যন্ত্র নাঙ্গল, মই ও বিন্দা। নাঙ্গল মধ্যে আবার কতকগুলি উপযন্ত্র আছে, যথা—কুটি, ডুকর, ফাল, কাটা, ঈষ ও জোয়াল। নাঙ্গলের যে অংশে কৃষক মুঠি করিয়া ধরে তাহার নাম কুটি। নাঙ্গলের যে অংশ মৃত্তিকা ভেদ করিয়া যায় তাহার নাম ফাল। ফাল লৌহ নির্ম্মিত। পুরাতন নাঙ্গলের মাথায় ফাল লগ্ন করার সন্ধিস্থলে আর একখান কাষ্ঠ থাকে তাহার নাম ডুকর। কাটা দ্বারা ফাল নাঙ্গল বা ডুকর গাত্রে লাগান হয়। দুইটি বলদে নাঙ্গল বহন করে। ঐ বলদের স্কন্ধোপরি যে একখান কাষ্ঠ থাকে তাহার নাম জোয়াল। জোয়াল ও নাঙ্গল উভয় যে কাষ্ঠ দণ্ডে সংযুক্ত থাকে তাহার নাম ঈষ। ঈষ ও জোয়াল বন্ধনের দড়ির নাম লেঙ্গরা। জোয়ালের দুই দিকে দুই খান লাঠির ন্যায় দণ্ড বিদ্ধ থাকে তাহাকে হিমল কহে। হিমলে যে দড়ি দ্বারা বলদ বদ্ধ থাকে ঐ দড়ির নাম জুইত। হিমল থাকায় বলদদ্বয় পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না।

নাঙ্গল দ্বারা মৃত্তিকা ভেদ করা হয়। মই দ্বারা ঐ মৃত্তিকা পাইট করিতে হয়। নাঙ্গল দ্বারা মৃত্তিকা ভেদ সময়ে যদি

মৃত্তিকা বড় বড় চাকা আকারে উঠে তবে মুদ্গর দ্বারা তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। মৃত্তিকা উত্তম পাইট হইলে বীজ বপন করিবে। বীজের ছোট ছোট চারাগুলিকে ফাক ফাঁক করিয়া দেওয়া ও ঘাস উঠাইয়া ফালান ও চারাগাছের গুড়ির মৃত্তিকা ফাস করিয়া দেওয়ার জন্য বিন্দা দেওয়া আবশ্যক। সকল শস্যে বিন্দা দিতে হয় না। ধান্য, যব, গম, পাট ও চিনা প্রভৃতির ফশলে প্রয়োজনমতে বিন্দা দেওয়া উচিত।

বলদ লাঙ্গল চালনার প্রধান সহায়। বলদ যত বলিষ্ঠ হইবে ভূমি চাস কৃষকের পক্ষে তত সহজ হইবে। বলদ বলিষ্ঠ না হইলে সময়ও অধিক ব্যয় হইবে এবং ভূমি সুন্দর পাইট হইবে না। ইংলণ্ড প্রভৃতি কৃষি প্রধান দেশে বিজ্ঞান বলে কৃষকগণ বলদের প্রয়োজন সাধন করিতেছে কিন্তু আমাদের দেশে সেই-রূপ হওয়া বহু দূরের কথা। অতএব বলদের উন্নতি বিধান করা কৃষকশ্রেণীর সর্ব্বাদৌ কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের কৃষকগণ সেই দিকে দৃষ্টিপাতও করে না। বলদ দুর্ব্বল হওয়ায় চাসের প্রচুর ক্ষতি হইতেছে। লাঙ্গলের ফাল যত দীর্ঘ ও প্রশস্ত হয় মৃত্তিকা তত অল্প সময়ে চাস হয়। পরাসরের * সময়ে ফালের দৈর্ঘ ১ হাত ৫ অঙ্গুলি ও প্রশস্ত তদানুরূপে ছিল। এখনকার ফাল দীর্ঘে ½ হাত প্রশস্তে ৪ অঙ্গুলিরও ন্যূন। গো জাতির উন্নতি দিন দিন যেরূপ অধোদিকে হইতেছে দৃষ্ট হয় ইহাতে শীঘ্রই ফালের দৈর্ঘ্য প্রশস্ত আরও ন্যূন করিতে হইবে। বাস্তবিক গোজাতির দুর্ব্বলতায় কৃষি কার্য্যের বিস্তর ক্ষতি হইতেছে।

* পরাসরের কৃষি বিষয়ক গ্রন্থের নাম "কৃষি-পরাসর"।

গরু কৃষকগণের প্রধান সহায়। অথচ গোজাতির উন্নতি জন্য কৃষকগণের যত্ন বা উদ্যোগ কিছুমাত্র নাই। গোপালকের ত্রুটিতে যে গরুর উন্নতি হয় না, এবিষয়ে আর সন্দেহ নাই। গরুগুলিকে উপযুক্ত পরিমাণে আহার দেওয়া হয় না। শ্রান্তি জন্য উপযুক্ত পরিমাণে বিশ্রামের সময় দেওয়া হয় না। গাভীর পাল দেওয়া সম্বন্ধে কাহারও দৃষ্টি নাই। দুর্ব্বল ষাড়ের বীজ দ্বারা যে বৎস উৎপন্ন হয়, তাহা যে স্বভাবতঃ দুর্ব্বল হইবে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। অতএব যাহারা গাভী গরু পালন করেন তাঁহাদের পালের মধ্যে এক একটি তেজস্বী ষাড় রাখা কর্ত্তব্য।

অনেক কৃষক গাভী দ্বারা হাল বহন করাইয়া থাকে। তাহাতে ত্রিবিধ ক্ষতি হয়। ১ম, হালে বল প্রয়োগ করায় দুর্ব্বলা গাভী আরও দুর্ব্বলা হইয়া পড়ে। ২য়, দুর্ব্বলা গাভীর বৎসগুলি দুর্ব্বল হইয়া যায়। ৩য়, গাভীতে দুগ্ধ দেয় না। সুতরাং গাভী দ্বারা হাল বহন নিতান্ত অন্যায়।

বলদের পরিবর্ত্তে অনেকে মহিষ দ্বারা হাল চালনা করিয়া থাকে। অনেক বলদ অপেক্ষা মহিষ বলিষ্ঠ সুতরাং মহিষ দ্বারা হাল বহন প্রথা হিতজনক কিন্তু রৌদ্রের সময়ে মহিষ চলিতে পারেনা তজ্জন্য সময় ক্ষতি হয়। যেদেশে রোপা ধান্যের প্রচলন আছে তথায় বলদ অপেক্ষা মহিষের দ্বারা হালের কার্য্য সুবিধার সহিত চলে। কারণ রোপা ধান্য বপনের ভূমি জলমগ্ন থাকে, তাহা কর্দ্দমিত নাকরিতে পারিলে রোপা রোপণ করা যায় না। জলমগ্ন ভূমি কর্দ্দমিত করার জন্য চাস করিতে বলদ যত শীঘ্র পরিশ্রান্ত হইবে মহিষ তত শীঘ্র পরিশ্রান্ত হইবে না।

বলদ ধরিয়া আনিয়া হালে জুরিলেই যে কার্য্য করাযায় এমত নহে। বলদকে পূর্ব্বে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। তজ্জন্য সমস্কন্ধের সমান জোরদার দুইটি বলদের স্কন্ধে জোয়াল কিম্বা জোয়াল তুল্য কোন দণ্ড প্রদান করিয়া ক্রমে শিক্ষা দিতে হয়। একটা শিক্ষিত বলদের সঙ্গে অশিক্ষিত একটা জুরিয়া দিলে অশিক্ষিত টি শিক্ষিত হইবে; এক একটি বলদ এইরূপ শিক্ষিত হইয়া থাকে যে জোয়াল পাতিলেই তাহারা আপনা হইতে স্কন্ধ পাতিয়া দেয়। মহিব কিছু অশান্ত, এই জন্য উহার নাশা ছিদ্র করিয়া কোন কোন কৃষক ঘোটকের লাগামের ন্যায় এক এক গাছা রজ্জু আপন হস্তে রাখিয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভূমি।

ভূমিরই অপর নাম মাটী। মাটীকে আমরা নিতান্ত সামান্য দ্রব্য মনে করিয়া থাকি কিন্তু মাটী আমাদের জীবন উপায়ের একমাত্র সাধন। মাটীর মধ্যে বিশ্বনাথ ভগবান এমন এক শক্তি প্রদান করিয়াছেন যে, সে শক্তি নাথাকিলে নিত্য প্রয়োজনীয় বৃক্ষ, লতা, তরু ও গুল্মাদি কিছুই জন্মিতে পারিত না। সেই শক্তির নাম উৎপাদিকা শক্তি। এই শক্তি কৃষি কার্য্যের মূল,—কৃষকের প্রধান অবলম্বন। উত্তম কৃষকই বল আর সাধারণ কৃষকই বল এই উৎপাদিকা শক্তি বিষয়ে যাহার কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা নাই তাহারা কৃষিকার্য্যে লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইতে পারে না। যে

ভূমি কৃষিকার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় সেই ভূমি প্রধানতঃ এই তিন ভাগে বিভক্ত যথাঃ—আঠাল মাটী, বালি ও বোদ মাটী। যে মৃত্তিকা জলযুক্ত হইলে কমি বেশী পরিমাণে আঠা আঠা বোধ হয়, তাহাই আঠাল মাটী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার আকার যে মৃত্তিকা তাহার নাম বালি এবং অনেক মাটীর নীচে কাল রঙ্গের যে মাটী থাকে তাহার নাম বোদ মাটী। এই সব মাটীর মিশ্রণে বা প্রাকৃতিক কোন পরিবর্ত্তনে মাটীর অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। ঐ পরিবর্ত্তিত মৃত্তিকায় আবার পৃথক পৃথক নাম আছে। আঠাল মাটীতে বালির অংশ থাকিলে তাহাকে দোআঁশ মাটী, নিম্ন জমিতে জল গড়াইয়া আসিয়া যে মাটী জমাট হয় তাহাকে পলি মাটী; গো ও ঘোটক প্রভৃতির মল এবং অন্যান্য দ্রব্যজাত মৃত্তিকার সহিত পচিয়া যে মাটী হয় তাহাকে ফাস মাটী কহে। কৃষিকার্য্যের জন্য ফাস মাটি বড়ই প্রয়োজনীয়।

কিরূপ মাটীতে কিরূপ ফশল জন্মে তাহা নিম্নে লিখা গেল।

বিলস্থ জমিতে ধান্য জন্মে। বালি বা বালিযুক্ত জমিতে চিনা, কাওন, আশুধান্য, পাট, কাঁকুড়, তরমুজ ও পটল প্রভৃতি জন্মে। কাল জমিতে ইক্ষু, কার্পাস প্রভৃতি বেশ হয়। লালবর্ণ মৃত্তিকা স্বভাবতঃ সসার ইহাতে সকল ফশলই জন্মে।

আবাদের যোগ্যাযোগ্য বিবেচনায় ভূমি সকল প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত যথা—অজ পতিত, আবাদ যোগ্য পতিত ও ফশলী ভূমি। অজ পতিত জমিতে কোন প্রকার শস্য হয় না। এই জমিকে লোকে অনুর্ব্বরা জমি কহে। আবাদ যোগ্য পতিত ও ফশলী জমি মাত্রই উর্ব্বর শব্দ বাচ্য, তবে কোন ভূমিতে অধিক ফশল হয় কোন ভূমিতে অল্প ফশল হয় মাত্র। পতিত জমিত

তুলনায় ফশলী জমি মাত্রেরই নাম উর্ব্বর কিন্তু সচরাচর যে ভূমিতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয় তাহাকে লোকে উর্ব্বরা ভূমি কহে। উৎপন্ন ফশলের পরিমাণ অনুসারে ফশলী জমির চারিটি বিভাগ আছে যথা—আউয়াল, দুয়ম, ছিয়ম ও চাহারম *। যে ভূমিতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়, সে ভূমির নাম আউয়াল। তাহার নিম্নে দুয়ম, তাহার নিম্নে ছিয়ম, তন্নিম্নে চাহারম। যে ভূমিতে ফশল উৎপন্ন হইতে পারে কিন্তু কৃষকের ত্রুটিতে বা অভাবে পতিত থাকে সেই ভূমিকে পতিত ভূমি বলা যায়। অনেক কৃষক বেশী ফশল উৎপন্ন হইবে বলিয়া মধ্যে মধ্যে দুই একবৎসর ভূমি স্বেচ্ছায় পতিত রাখে, এমত ভূমি পতিত শব্দ বাচ্য কিন্তু কৃষকের ত্রুটিতে যদি কোন আওয়াল জমি পতিত থাকে তাহাকে বাস্তবিক পতিত নাবলিয়া জোত পতিত বলার প্রথা আছে।

উৎপন্ন ফসলের নামানুসারে দেশ বিশেষে আবাদী ভূমির নির্দ্দিষ্ট নাম আছে। যে ভূমিতে আশুধান্য জন্মে তাহাকে আউশা ভূমি কহে। যে ভূমিতে বাওয়া ফশল জন্মে তাহাকে বাওয়া জমি কহে। কোন কোন আউশা জমিতে আউশ কাটার পর কৃষকেরা সরিষা উৎপাদন করে উক্ত ভূমিকে দোশার আউশ বলে। বাওয়া জাতীয় যে ভূমিতে আউশ উৎপন্ন করিয়া বাওয়া ফসল করে সেই ভূমিকে দোশার বাওয়া বলা যায়। আর একপ্রকারের জমিতে কেবল বোড় ধান্য উৎপন্ন হয়, সেই সব জমিকে বোড় জমি কহে। যে জমিতে কেবল ছন উৎপন্ন হয় সেই জমিকে ছন জমি কহে। কি আউশা জমি কি বাওয়া জমি

* শেরপুর পরগণায় উক্ত প্রকার, জমি ১ সরহ, ২ সরহ, ৩ সরহ, ও ৪ সরহ নামে খ্যাত।

সকল প্রকার জমিতেই অধিক ও অল্প পরিমাণে কৃষকগণ অন্যান্য ফশল * উৎপাদন করিয়া থাকে কিন্তু সেই সব ফশলের নাম অনুসারে তাহার নাম হয় না।

সার।

মৃত্তিকাস্থ যে পদার্থের দ্বারা উদ্ভিদ বর্দ্ধিত ও ফল পুষ্প সম্পন্ন হয় তাহাকে সার কহে। সার প্রধানত চারি প্রকার (১) প্রাকৃতিক, (২) উদ্ভিদজ, (৩) প্রাণীজ ও (৪) খণিজ। জল, বায়ু ও তেজ প্রাকৃতিক সার, লতা পাতা প্রভৃতি পঁচিয়া যে সার হয় তাহা উদ্ভিদজ সার, প্রাণী মাত্র মরিলে তাহার অস্থি, পঞ্জর মেধ পঁচিয়া যে সার হয়, তাহা প্রাণীজ সার এবং খণিজাত লৌহ প্রভৃতি রূপান্তরিত হইয়া যে বৃক্ষের শক্তি বৃদ্ধি করে তাহাকে খণিজ সার কহে।

স্বাভাবিক মৃত্তিকা সসার। কিন্তু পুনঃ পুনঃ শস্য উৎপন্ন হইতে হইতে মৃত্তিকার সারভাগ কমিয়া যায় সুতরাং শস্য ক্রমে কম হইতে থাকে অতএব অসার বা অল্প সার মৃত্তিকাতে শস্য উৎপাদন করিতে হইলে উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রদান করিয়া মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষের ভূমি স্বাভাবিক সসার। এদেশে আপনা আপনি মৃত্তিকার গুণে যে ফশল উৎপন্ন হয়, অন্য প্রদেশের মৃত্তিকাতে যত্নের

* চিনা, কাউন, কলাই, মরীচ, কচু ও বেগুন প্রভৃতি। এই সবকে বাজে কৃষি বা কু-কৃষি কহে।

সহিত শস্য রোপন করিলেও তত শস্য উৎপন্ন হয় না। এই জন্য ভারতবর্ষকে স্বর্ণ ভূমি বলিয়া থাকে। আপনা হইতে শস্য উৎপন্ন হয় বলিয়া ভারতবর্ষের কৃষক শ্রেণী কৃষি সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে মনোযোগ করিতে চায় না।

এ দেশের কোন ভূমি সমুচিত শস্য উৎপাদন করিতে না পারিলে কৃষক ১ কি ২ বৎসরকাল পতিতভাবে ফেলিয়া রাখে তাহাতেই সে ভূমির প্রচুর উর্ব্বরাশক্তিবৃদ্ধি পায়। কারণ উক্ত ভূমির উপর যে সব তৃণ জন্মে তাহা পচিয়া সার হয় এবং তৃণভোজী গো, মহিষাদির মলেও সে ভূমিতে সার জন্মে। বাস্তবিক সমস্ত ভূমিই সময় বুঝিয়া কখন কখন পতিত রাখা কর্ত্তব্য। তাহাতে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি হ্রাস না হইয়া বর্দ্ধিত হয়। যে বৎসর পতিত থাকে তাহার ফশল ক্রমে পর পর বৎসরে বর্দ্ধিত হারে পাওয়া যায় সুতরাং সার বৃদ্ধির জন্য ভূমি ১ কি ২ বৎসর পতিত রাখায় কৃষকের ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। বর্ষার জলেও অনেক ভূমি উর্ব্বরা হইয়া থাকে। লাবণিক পদার্থ ও যবক্ষারজান উদ্ভিদের সম্বন্ধে বিশেষ উপযোগী, ইহাতে উদ্ভিদ সকল তেজস্বী, সবল ও ফলশালী হয়। জোয়ারের জলে ও বৃষ্টির জলে এই দুই পদার্থ প্রচুর পরিমাণে আছে অতএব বৃষ্টি ও প্লাবন ফসলের পক্ষে উপকারক। প্লাবন বা জোয়ারে যে কেবল ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয় এমত নহে উহাতে বৎসর বৎসর পলন পড়িয়া নিম্নভূমিকে উন্নত করিয়া শস্য শালিনী করে। কোন স্থানে গর্ত্ত থাকিলে ক্রমে তাহারা পূর্ণ হইয়া সমভূমি হয় এবং ফশল উৎপাদনের যোগ্য হইয়া উঠে।

চূণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উদ্ভিদের উপকারক নহে কিন্তু পরোক্ষ-

ভাবে উদ্ভিদের যথেষ্ট উপকার করিয়া থাকে সুতরাং চূণকেও ভূমির সার বলা অসঙ্গত নহে। মৃত্তিকাস্থ লৌহ ঘটিত পদার্থ ও খনিজ পদার্থকে চূণে কোমল করিয়া ফেলে সুতরাং সহজে উদ্ভিদের মূল প্রশারিত হইয়া দূরস্থ শোষক পদার্থ বৃক্ষের গ্রহণোপযোগী করে। এই জন্য চূণ যে বড় বেশী দিতে হয় এমত নহে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে প্রতি বিঘা ভূমিতে ।০ হইতে ।৫ পনর সের পর্য্যন্ত চূণ দিলেই যথেষ্ট হইয়া থাকে।

হাড়ের গুঁড়া কৃষিকার্য্যের জন্য বড় উপাদেয় সার। দেশীয় কৃষকগণ ইহার ব্যবহার জানে না। যে সব স্থানে গো-হাড় ফালায় ঐ সকল জমি কালে আবাদ হইলে তাহাতে যে প্রচুর শস্য জন্মে তাহারও কারণ হাড়ের সার। হাড় বড় দৃঢ় পদার্থ, ইহা গুড়া করা কঠিন বিবেচনায় অনেকে তাহা ব্যবহার করে না। হাড় সকল কুড়াইয়া একটা গর্ত্তে রাখিতে হয় পরে তাহার উপরে গো-মল বা আগাছাদি ও তদুপরে মাটীর চাপ দিয়া ৪।৫ মাস রাখিলে হাড় গুলি পঁচিয়া নরম হয়। তৎপর ঢেঁকিতে গুড়া করিয়া মাটিতে মিশ্রিত করিয়া দিলে মাটী যথেষ্ট সার হইয়া থাকে। কলিকাতা অঞ্চলের অনেক ব্যবসায়ী মফস্বল হইতে হাড় কুড়াইয়া লইয়া যায়। হাড় যেরূপ উপাদেয় ইহাতে হাড় অন্যকে নিতে দেওয়া কোন কৃষকেরই উচিত নহে। অনেকে হাড়কে অপবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকে। বাস্তবিক হাড় ব্যবসার জন্য ব্যবহারে কোন দোষ নাই। মনুষ্য মল পর্য্যন্ত যখন কৃষিকার্য্যে ব্যবহারে আইসে, তখন হাড় ব্যবহারে কোনই আপত্তির কারণ হইতে পারে না। আলু, কপি, মুলা প্রভৃতির জন্য আবাদি জমিতে হাড়ের সার দেওয়া নিতান্ত উচিত।

পটাশ, ম্যাগনেসিয়া, চূণ, ফসফরিক অম্লজান, যবক্ষারজান প্রভৃতি বৃক্ষের অত্যন্ত উপকারী সুতরাং এই সব পদার্থ যাহাতে অধিক মাত্রায় আছে তাহাই বৃক্ষের পক্ষে সার। খৈল নামক পদার্থে এই কয়েকটি পদার্থই আছে এ জন্য খৈল শস্য মাত্রের প্রধান সার। প্রতি বিঘা ভূমিতে ১/ এক মণ হারে খৈল চূর্ণ করিয়া কর্ষিত ভূমির সঙ্গে এগোয়ে দিতে হয়। গোল আলুর ভূমিতে খৈল দিলে গোল আলু যথেষ্ট বড় হইয়া থাকে।

মল মূত্র দ্বারাও মৃত্তিকা যথেষ্ট প্রকারে সসার হয়। গো-মলও গোমূত্রের সারবত্তা বঙ্গ দেশীয় কৃষক শ্রেণীর অবিদিত নাই। বঙ্গ দেশের কৃষকগণ সচরাচরই আউশ ও সর্ষা ক্ষেত্রের ভূমিতে চাসের পূর্ব্বে গো মল ও গো মূত্র দিয়া থাকে। অনেক দেশে অন্যত্রের গোশালা হইতে গোমল আনিয়া ক্ষেত্রে ফালায়। আবার কোন কোন দেশে গোশালা ঘর ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে সময় সময় লাড়িয়া দেয়। ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে গোশালা লাড়িয়া দেওয়াই সুবিধা, কারণ তাহাতে গোমল ও গোমূত্র উভয়ই পড়িয়া থাকে।

বালু এবং কর্দ্দমেও সার পদার্থ আছে কিন্তু উহা অন্য মাটির সহিতমিশ্রিত না হইলে কার্য্যকরী হয় না। বোদ মাটি ও এটেল মাটি যথেষ্ট সসার কিন্তু দেশ বিশেষে এটেল মাটির উপকারিতা কৃষকগণ বুঝিতে পারে না কারণ এটেল মাটিতে সহজে নাঙ্গল বসেনা সুতরাং শ্রমের ভয়ে কৃষক তাহা পরিত্যাগ করে। ঢাকার জিলাতে এরূপ দৃষ্ট হয়, ক্ষেত্রের মাটি বেশী আটাল হইলে ঐ মাটি কুম্ভকারে উঠাইয়া নেয়। পরে গর্ত্ত বর্ষার পলন মাটিতে পূর্ণ হইলে পুনরায় কৃষকগণ তাহাতে ধান্য রোপন করে। যেদেশে রোপা ধান্য বপনের প্রচলন, তথায় এটেল মৃত্তিকার

আদর আছে। বৃষ্টির জলে ঐ মাটি সহজে নরম হয়, তখন কৃষক ১ কি ২ চাস দিয়া পরে তাহাতে সহজে রোপা বপন করে তাহাতে প্রচুর শস্য পায়।

ভূমির উপর খর বিছাইয়া সেই খর অগ্নি দ্বারা দাহ করিলেও মৃত্তিকায় সার হয়। অনেক কৃষক ক্ষেত্রস্থ ধান্যের খর ক্ষেত্রে রাখিয়া তাহা অগ্নিদ্বারা জ্বালাইয়া দেয়, তাহাতে মৃত্তিকার উর্ব্বতা শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এ নিয়মটি বঙ্গ দেশীয় কৃষকের পক্ষে অতি সহজ।

মৃত্তিকা সসার করিবার জন্য আরও একটি সহজ উপায় আছে; কোন এক স্থানে একটি গর্ত্ত করিয়া সেই গর্ত্তটিকে বৃক্ষের ছাল, পাতা ও কোমল ডাল দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। উহা উত্তম রূপে পঁচিলে উৎকৃষ্ট সার হইয়া থাকে। পরে উহা ঝোড়ায় ভরিয়া পরিমাণ মতে ক্ষেত্রে দিলেই মৃত্তিকার উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি হইবে।

সাঁর সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইল ইহাতে দেখা যায়, জল চূন, অস্থিচূর্ণ, খৈল, পশু পক্ষাদির মলমূত্র, পলিমাটি, বোদ মাটি প্রকৃত সার। অতএব কৃষক মাত্রের আবাদী ভূমিতে উহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। শুদ্ধ স্বাভাবিক মৃত্তিকার উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। ভারত ভূমি স্বভাব সিদ্ধ উর্ব্বর। দিন দিন উক্ত উর্ব্বরতা শক্তির হ্রাস ভিন্ন বৃদ্ধি নাই; ভারতবাসী কৃষকের অজ্ঞতা ভিন্ন আর কিছুই ইহার কারণ নহে। কৃষকগণ যাহাতে বিজ্ঞ হইয়া সহজ সাধ্য সার পদার্থের ব্যবহার শিক্ষা করিতে সক্ষম হয়, তদ্বিষয়ে দেশহিতৈষী মহাত্মাগণের সর্ব্বতো-ভাবে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

অসাময়িক আহার যেমন দেহীর দেহ পুষ্টিসাধনে সক্ষম নহে। অসময়ে শস্য ক্ষেত্রে সার দিলেও সেই প্রকার ভূমির কোন উপকার হয় না। মাঘ ও ফাল্গুন মাসে সার প্রদান করিতে চেষ্টা করা কৃষক মাত্রের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

পাইট।

উপযুক্তরূপ শস্য উৎপাদন করিবার জন্য যেমন ভূমিতে সার প্রদান করা আবশ্যক, শস্য উৎপাদনের ভূমিকেও পাইট করা সেই প্রকার প্রয়োজন। ভূমি সসার হইলেও বিনা পাইটে আশানুরূপ ফশলপ্রাপ্ত হওয়া যায় না। এমন কি উপযুক্ত পরিমাণে ভূমি পাইট না করিয়া বীজ বপন করিলে সমস্ত বীজ অঙ্কুরিত হয় না এবং যাহা অঙ্কুরিত হয়, তাহাও পুষ্ট ও ফল ধারণের যোগ্য হয় না। ভূমির উষ্ণত্বও আলোদ্বারা উদ্ভিদ বর্দ্ধিত ও রস যুক্ত হয়। এই কারণেই ভূমি পাইট করা বিশেষ প্রয়োজন।

যদি কোন নূতন ভূমিতে শস্য উৎপাদন করিতে হয়, তবে আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাস মধ্যে উক্ত ভূমিকে চাস করিয়া রাখিবে। ইহাতে ভূমির আগাছা অনেক পরিমাণে মরিয়া যাইবে এবং ভূমির উষ্ণতা বৃদ্ধি হইবে। নূতন ভূমি যদি দৃঢ় হয়, নাঙ্গলের ফাল তাহাতে সহজে বিদ্ধ না হয়, তবে কোদালি দ্বারা ভূমিকে কাটিয়া রাখিবে। পরে বর্ষান্তে রীতি মত চাস করিয়া সরিষা বা অন্য ফশলের বীজ রোপন করিবে।

ধানী জমির ভূমি মাঘ ও ফাল্গুন মাসে চাস আরম্ভ করিবে। চৈত্র মাস মধ্যে চাসের কার্য্য ও পাইটের কার্য্য শেষ

হওয়া চাই, কারণ বৈশাখ মাস পড়িতে পড়িতেই আশু ধান্যের বীজ বুনিতে হইবে। যে সব ভূমিতে বাওয়া ধান্য ছিটা বুনিতে হয় তাহার বীজও ঐ সময়ে বপন করিবে। যে সব ভূমিতে বাওয়া ধান্য রোপা লাগাইতে হয়, সেই সব ভূমি এই সময়ে চাস করার আবশ্যক করে না। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে যখন বর্ষার জলে ভূমি ভিজিবে তখন নাঙ্গল দ্বারা ভূমিকে কর্দ্দমিত করিয়া ধান্যের গাছ একটি একটি করিয়া রোপণ করিয়া দিবে।

আশুধান্য ও পাটের বীজ রোপণ করিলে যেমন ঐ সব বীজ অঙ্কুরিত হয়, তেমন তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক গুলি আগাছা উঠে। তাহা কাঁচি দ্বারা উঠাইয়া ফেলিতে হয়। ইহাকে কৃষকগণ নিড়ান কহে। বীজ বপন সময়ে কৃষকগণ তত সতর্ক হইতে পারে না জন্য ফশলের গাছ গুলি অনেক ঘন ঘন হয়। ঘন বৃক্ষ তেজ শালী হয় না এবং তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে ফল ফলে না এবং বৃক্ষ গুলি কাষ্ট যুক্ত ও পুষ্ট হইতে পারে না। কারণ আলোক পাওয়া সম্বন্ধে অনেক বিঘ্ন ঘটে। আলোক উদ্ভিদের প্রাণ। চারা গাছ গুলি ফাক ফাক না হইলে আলো প্রাপ্ত হইতে পারে না এই জন্য কৃষকদিগকে নাঙ্গলিয়া বা বিন্দা দিতে হয়। ইহাতে অনেক দুর্ব্বল চারা উঠিয়া যায় এবং অন্য প্রকারে ঘাসও নষ্ট হয়। গাছে আলো লাগে ও ভূমিটা একটু একটু কর্ষিত হওয়ায় গাছের গুড়িতে তেজ প্রবিষ্ট হয়। ইহা সমস্তই উদ্ভিদের হিতজনক; অতএব বিন্দা দেওয়া কর্ত্তব্য। যে সব ক্ষেত্রে রোপা ধান্য বোনা হয়, সেই সব ক্ষেত্রে বিন্দা দেওয়ার কোন প্রয়োজন করে না।

ভূমি যত কর্ষিত হইবে কঠিন মৃত্তিকা তত হ্রাস হইবে

ফাস মৃত্তিকায় ভাল ফশল হয়। অতএব মৃত্তিকা কর্ষণ সম্বন্ধে কৃষক গণের বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

অনেকে বাড়ীর পালানে বা মাঠে টাল করিয়া থাকে। টালে কু-কৃষি হয়। সচরাচর ধান্য ও সরিষা ব্যতীত অন্যান্য ফশল তরকারী ইত্যাদিকে লোকে কুফশল কহিয়া থাকে। ধান্য সরিষা সুফশল নামে প্রসিদ্ধ কিন্তু কুফশলে কৃষক শ্রেণি সামান্য অর্থ অর্জ্জন করে না। একবিঘা জমির টালে এক একজন কৃষক বৎসরে ৩০।৪০ টাকা অর্জ্জন করিয়া থাকে।

টালে মূলা ইত্যাদি তরকারী সচরাচর হইয়া থাকে। এই সব ফশলের ভূমিকে বহুবার কর্ষণ করা আবশ্যক। এইরূপ প্রবাদ যে, শতেক চাস না দিলে মুলার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় না। বাস্তবিক টাল ভূমিকে এইরূপ চাসই করিতে হয়। যেরূপ চাসে টাল প্রস্তুত হয়, তুলার ভূমিকে তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ চাস করা উচিত এবং ধানী জমিকে তুলা ভূমির চাসের অর্দ্ধেক চাস করিবে। যে জমিতে পান উৎপাদন করিতে হইবে, তাহার ভূমি চাসের দরকার না থাকিলেও বেশ পরিস্কার রাখিতে হয়। চাস সম্বন্ধে কৃষক সমাজে প্রচলিত প্রবাদ বাক্য এইরূপঃ—

"শতেক চাসে মূলা
তার অর্দ্ধেকে তুলা,
তার অর্দ্ধেকে ধান
বিনা চাসে পান।"

মৃত্তিকা চাস ও পাইট এই দুইটিই কৃষকের সম্বন্ধে প্রধান কার্য্য। যদি উপযুক্ত সময়ে চাস ও ভালরূপে পাইটের কার্য্য সম্পন্ন হয়, তবে কৃষকের আর আনন্দের সীমা থাকে না।

কৃষকগণ বহুদিনের অভিজ্ঞতায় কতকগুলি প্রবাদ প্রকটন করিয়াছে। ঐ সকল প্রবাদ খনার বচন বলিয়াও খ্যাত। বাস্তবিক এই সব প্রবাদ খনার কৃত কি না তদ্বিষয়ে বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। এই সব প্রবাদের উপর নির্ভর করিলে অনেক সময় আবাদ কার্য্যের সুবিধা হইতে পারে এই জন্য নিম্নে তাহার কয়েকটির উল্লেখ করা গেল।

চৈতে গরমি বৈশাখে জাড়া,
প্রথম আষাঢ়ে ভরে গাড়া।
ডেকে বলে এতিন বাণি,
শ্রাবণে ভাদ্রে না বর্ষে পাণি।

চৈত্র মাসে যদি অত্যন্ত গড়ম পড়িয়া বৈশাখ মাসে কিছু কিছু শীত বোধ হয়, তবে শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে বেশী বৃষ্টি হয় না।

শ্রাবণে ভাদ্রে বহে ঈশান,
কান্দে কোদাল নাচে কৃষাণ।

শ্রাবণ এবং ভাদ্র মাসে যদি ঈশান কোন হইতে বাতাস বহিতে থাকে, তবে কৃষকগণের সুখের সম্ভাবনা আছে।

আষাঢ়ে নবমী শুক্লে পথা।
কি কর শ্বশুর লেখা জোখা॥
যদি বর্ষে মুসল ধারে,
সমুদ্র মধ্যে বগা চরে,
যদি বর্ষে কণা কণা,
তাল গাছে হয় শোলের পণা।
যদি বর্ষে ফিশ্ ফিশ্,
পর্ব্বতে ছাড়ে ধানের শীষ।

হেসে সূর্য্য ব'সে পাটে,
চাসার গরু বিকায় হাটে।

আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষের নবমী তিথিতে (ফিরা রথের পূর্ব্ব দিন) যদি মুশল ধারে বৃষ্টি হয়, তবে সেই বৎসর জল হয় না এবং ঐ তিথিতে যদি কণা কণা রূপ বৃষ্টি হয়, তবে অত্যন্ত জল হইয়া থাকে এবং ফিশ্ ফিশ্ করিয়া ক্ষণিক বৃষ্টি হইলে সেই বৎসর প্রচুর শস্য হইয়া থাকে ও ঐ তারিখে হাসি হাসি ভাবে সূর্য্য দেব অস্ত গত হইলে দুর্ভিক্ষের প্রচুর আশঙ্কা।

পাইট্‌করার সময়ে কৃষক যদি ভাবী জলের বিষয় অবগত হইতে পারে তবে ফশল সম্বন্ধে বহু উপকারের সম্ভাবনা।

পৌষ মাসে যদা বৃষ্টি,
তদা কুজ্ঝটিকা ভবেৎ;
তদাদৌ সপ্তম মাসে,
বারি পূর্ণা বসুন্ধরা।

পৌষ মাসে যদি যেমন বৃষ্টি তেমন কুজ্ঝটিকা হয় তবে আষাঢ় মাসেই বসুন্ধরা জলে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।

যদি বর্ষে আগনে
রাজা নামে মাগনে;
যদি বর্ষে পৌষে,
কড়ি হয় তুষে;
যদি বর্ষে মাঘের শেষ
ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।

অগ্রহায়ণ মাসে বৃষ্টি হওয়া দুর্ভিক্ষের লক্ষণ। পৌষ মাসের বৃষ্টিতেও প্রায় সেই প্রকার ফল প্রদান করিয়া থাকে। মাঘ

মাসের শেষ পর্য্যন্তবৃষ্টি হইলে বিলক্ষণ সুবিধা হইয়া থাকে। কারণ মাঘ মাসে বৃষ্টি না হইলে জমিতে লাঙ্গল দেওয়া একরূপ কঠিন হইয়া উঠে।

কৃষকের মেঘ, বাতাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনায় অভিজ্ঞতা না থাকিলে কৃষি কার্য্যে সুবিধা হয় না সুতরাং নিম্নলিখিত সঙ্কেতটি সকল কৃষকের জানা থাকা প্রয়োজনঃ—

কোদালে কোদালে মেঘ হয়,
এলে মেলো বাতাস বয়;
শ্বশুরকে বল বাস্তে আল,
বৃষ্টি হবে আজ কাল।

মেঘ কোদালে কোদালে অবস্থায় আকাশে বিস্তার হইলে ও এলো মেলো ভাবে বাতাস বহিতে থাকিলে দুই এক দিনের মধ্যে বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা।

কাকরা ঘন সিং শুকান,
কন্যা কাণে কাণ;
বিনা বাতাসে তুলায় ভিজে,
কোথা রাখবে ধান।

শ্রাবণ মাসে যদি ঘন বৃষ্টি হয়, এবং ভাদ্র মাসে যদি রৌদ্র হয় ও আশ্বিন মাসে যদি ভরা জল হয় আর কার্ত্তিক মাসে বাতাস না হইয়া যদি জল হয় তাহা হইলে প্রচুর ধান্য হইয়া থাকে।

চৈত্র মাসে হট কালা,
সেই বৎসরে নাহি ভালা।

চৈত্র মাসে বৃষ্টি হইলে সেই বৎসরের কখনও শুভ হয় না।

কিরূপ কৃষকে কিরূপ ফল প্রাপ্ত হয় তাহাও কৃষকের সর্ব্বদা

স্মরণ রাখা আবশ্যক তজ্জন্য এই সঙ্কেতটিও এস্থলে লিখা গেল।

থাটে থাটায়ে লাভের গাতি,
তার অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতি ;
ঘরে ব'সে পুছে বাত,
তা'র ন্যায় নাই হাবাত।

যে কৃষক স্বয়ং কৃষি কার্য্যে থাটে এবং কৃষক সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া থাটায়,সে কৃষক বেশ ফশলপ্রাপ্ত হয় এবং যে কৃষক ছাতি মাথায় দিয়া পিছে পিছে থাকিয়া কৃষক ভৃত্যকে থাটায় সে অর্দ্ধেক ফশল প্রাপ্ত হয়। আর যে ব্যক্তি ঘরে থাকিয়া কেবল চাকর কৃষককে কার্য্যের কথা জিজ্ঞাসা করে, সেই ব্যক্তির অভাব ঘুচে না।

বীজ বপনের পূর্ব্বে ভূমি উত্তমরূপে পাইট হওয়া যেমন প্রয়োজন, ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতির অবস্থা বিষয়ে কৃষকের অভিজ্ঞতা থাকাও তেমন আবশ্যক। অনেক সময়ে এমন দেখা যায় যে, বৃষ্টি হইবে কি না তদ্বিষয় জানিতে না পারায় কৃষক অপ্রস্তুত থাকে, পরে হাহাকার করে। সে হাহাকারে কোন লাভ হয় না। হয়ত পুনরায় বৃষ্টির জন্য বসিয়া থাকিতে থাকিতে বীজ বপনের সময় অতীত হইয়া যায় বা বৃষ্টির আশায় বীজবপন করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া বসিয়া থাকে। এইজন্য ঝড় বৃষ্টির গতিনতি বুঝিবার জন্য কৃষকের যতদূর সম্ভব অভিজ্ঞতার দরকার। ভারত-বর্ষের কৃষকশ্রেণী বিজ্ঞানবিদ্ হওয়া আশু অসম্ভব। এই জন্য আমরা কৃষি পরাসরের একটি প্রয়োজনীয় মাস বিভাগের এস্থলে উল্লেখ করিলাম। আমরা ৭।৮ বৎসর পর্য্যন্ত এই বিভাগের যথার্থ্য পরীক্ষা করিয়া ফলপ্রাপ্ত হইয়াছি। কৃষক মাত্রের এই মাস বিভাগ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

মাকে পৌষ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২॥দিন	২॥দি	২॥দিন	২॥দি	২॥দি	২॥দি	২॥দি	২॥দি	২॥দি	২॥দি	২॥দি	২॥দি = ৩০ দিন।
পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্ত্তিক	অগ্রহায়ণ

কৃষি পরাশরের উক্ত মাস বিভাগের যে মাসে যেরূপ অবস্থা হইবে, বৎসরের সেই সেই মাসে প্রায় সেই অবস্থা ঘটিয়া থাকে। ইহা স্মরণ রাখিলে পাইট ও বীজ বপন সম্বন্ধে কৃষকের অনেক সুবিধা হইবার কথা।

তৃতীয় অধ্যায়।

বীজ।

কৃষি কার্য্যের প্রধান উপাদান ক্ষেত্র ও বীজ। ক্ষেত্রের বিষয় পূর্ব্বে কথঞ্চিৎ বিবৃত করা গিয়াছে। এই অধ্যায়ে বীজের বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

উত্তম বীজের সর্ব্বদাই প্রয়োজন। বীজ ভাল না হইলে কখনও ভাল ফশলের আশা করা যাইতে পারে না। বীজ বলিতে অনেকে ফল বা ফলের আভ্যন্তরিক বৈজিক পদার্থকে বোধ করিয়া থাকেন কিন্তু তাহাই যে মাত্র বীজ, এমত নহে। বীজ নানা প্রকার। যে বস্তু যাহা দ্বারা উৎসন্ন হয় তাহারই নাম বীজ। উদ্ভিদ, শাখাতে জন্মে, ফলেতে জন্মে, বিচিতে জন্মে, মূলে জন্মে ও পত্রেতে জন্মে সুতরাং শাখা, ফল, বিচি, মূল ও পত্র সকলই বীজ।

বীজ সুপক্ক ও শস্যের উত্তমাংস হওয়াই বিশেষ দরকার। বীজ সুপক্ক না হইলে সকল বীজ অঙ্কুরিত হয় না। দেখা গিয়াছে ক্ষেত্রের ভাল পাটগাছ কৃষক কাটিয়া লইয়া পার্শ্বস্থ ছোট ও দুর্ব্বল গাছ বীজের জন্য রাখিয়া দেয়। ইহাতে ফল এই হইতেছে যে, পাটের অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতেছে। অনেক কৃষকের মুখে শুনা যায় এখন পাটের আবাদ ভাল হয় না। ভাল না হইবার উহাও যে এক কারণ এবিষয়ে কেহ অনুধাবন করেন না। অতএব ক্ষেত্রের ফশলের উত্তমাংশ হইতে বীজ গ্রহণ করিবে।

ধান, যব, গম, তিল, সরিষা, মুগ খেশারি প্রভৃতি ঔষধি জাতীয় উদ্ভিদের বীজ খুব পক্ক দেখিয়া সংগ্রহ করিবে। নারি-

কেল ও সুপারি জাতীয় উদ্ভিদের বীজও সেইরূপ পরিপক্ক দেখিয়া রাখিতে হইবে। যত বেশী বয়সের বৃক্ষ হইতে পরিপক্ক বীজ রাখিবে সেই বীজের বৃক্ষ প্রায় ততদিন বাচিয়া থাকে। অতএব নারিকেল ও সুপারির বীজ পুরাতন বৃক্ষ হইতেই রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শাখা, মূল ও পত্রোৎপন্ন বীজ ব্যতীত অন্য সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিদ জাতীয় ফল উত্তমরূপে পরিপক্ক ও শুষ্ক করিয়া রাখিতে হয় অন্যথা বীজ মধ্যে কীট জন্মিয়া বীজের উৎপাদিকা শক্তিকে নষ্ট করিয়া ফেলে।

ধান্য নানা বিধ। সকল প্রকার ধান্যের বীজই একরূপ প্রণালীতে রাখিতে হয়। খুব পরিপক্ক ধান্যকে ভালরূপ শুষ্ক করিয়া ডোল বা মৃত্তিকার বাসনে যত্নের সহিত রাখিয়া দিতে হইবে। কোন কোন কৃষক বীজ ধান্য খরেরমোচা বান্দিয়া রাখিয়া দেয়। বীজ পুনঃ পুনঃ রৌদ্রে দেওয়ার কোন প্রয়োজন করে না।

লাউ, কুমরা, বেগুণ ও শসা প্রভৃতির গাছ-পক্ক ফল বীজের জন্য রাখিবে। গাছের প্রথম ফলই বীজের জন্য রাখা উচিত। গাছ যত দিন জীবিত থাকিবে বীজের জন্য রক্ষিত ফল ততদিনই গাছে রাখিয়া দিবে। পরে গাছ হইতে ফল উঠাইয়া দানা গুলিকে ধৌত করিয়া সাবধানে রাখিয়া দিবে। মিষ্টকুমড়া ও বেগুণের দানা ধৌত করিবে না। ছাই মাখিয়া শুষ্ক করিয়া রাখিবে। ধৌত করিলে কুমড়া ও বেগুণ সুস্বাদু হয় না। এই সব দানা কাচ নির্ম্মিত পাত্রে রাখিলেই সুন্দর থাকে। কৃষকেরা বীজের প্রতি সমুচিত যত্ন করে না বলিয়া ফসলের অবস্থা দিন দিন মন্দ হইয়া উঠিতেছে।

বীজ সংরক্ষণ সম্বন্ধে মহর্ষি পরাশর নিয়ম অবধারণ করিয়া

ছেন যে, গোশালা রন্ধন গৃহ এবং সূতিকা গৃহে বীজ রাখা অন্যায়। গর্ভিণী, নব প্রসূতি স্ত্রী, ঋতুবতী স্ত্রী ও বন্ধ্যা এবং অশুচি ব্যক্তিকে বীজ স্পর্শ করিতে দিবে না। এবং বীজ বপন সম্বন্ধেও পুরাশর বলিয়াছেন যে, বৃহস্পতি, শুক্র ও সোম বারে বীজ বপন করিবে।

বীজ সম্বন্ধে সাধারণ দুই চারিটি প্রয়োজনীয় তত্ত্বমাত্র প্রদর্শিত হইল। বীজ সম্বন্ধে জানিবার বহু বিষয় আছে। তত্তাবৎ লিখিতে গেলে একখান স্বতন্ত্র গ্রন্থই লেখার আবশ্যক। কৃষকের জন্য সেই সব কথার আপাততঃ প্রয়োজনাভাব। অতঃপর স্থূল স্থূল ব্যবহারোপযোগী যে সব কথা না বলিলে চলিবেনা, তাহা শস্যের বিস্তৃত বিবরণের সঙ্গে যথা সম্ভব উল্লেখ করিব।

সময়।

কৃষকের বিশ্রাম নাই। অলসের জন্য কৃষি কার্য্য নহে, তাই বলিয়া রাত্রিতে কৃষিকার্য্য করিবেনা। কৃষি কার্য্যের জন্য দিবাই প্রশস্ত। বৎসরের কোন্ মাসে কৃষককে কি কার্য্য করিতে হয়, তাহা জানা আবশ্যক বলিয়া বার মাসের কৃষি কার্য্যের বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে।

বৈশাখ—এই মাসে জল হইতে আরম্ভ হইলেই আশুধান্য, অরহর কলাই, হলুদ, ওল, আদা, কচু, বিলাতি কুমড়া, শশা, পাট ডাটা, ইক্ষু, করল্লা প্রভৃতির আবাদ করিবে। এমাসে ক্ষেত্রে বিন্দা দিবে। শাকের ক্ষেত্রে ঘাস হইতে দিবে না। এই মাসে কৃষকের নিড়ান দেওয়ার সময়। এই মাসে যাহারা নিড়াে নয়

কার্য্য শেষ না করিতে পারে সেই কৃষক সুকৃষক নহে।

জ্যৈষ্ঠ—এই মাসে আম, জাম কাঁঠাল খেজুর লিচু প্রভৃতির চারা রোপণ করিবে। বেগুনের চারাও এই মাসে লাগাইতে হয়। এই মাসে উপরের লিখিত চারার নীচে সার দিবে। এই মাসে আদা ও আদা জাতীয় চারার ক্ষেত্রে নিড়ান দিতে হয়।

আষাঢ়—এই মাসে বেগুনের চারা মরীচের ও দানা পুতিতে হয়। নারিকেলের চারাও এই মাসে পুতিবে। আনারসের মুথীর গোরায় গোবর দিয়া তাহা এই মাসেই পুতিবে। তাল ও খেজুরের আঁটীও এই মাসে বপন করিবে।

শ্রাবণ—এই মাসে বড় বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির জল যদি গাছের গোড়ায় জমে তবে তাহা সরাইয়া দিবার জন্য নালা প্রভৃতি কাটিয়া দিবে। এই মাসে মরীচের চারা লাগাইবে। বেগুণ, আদা ও হলুদের গাছের গোড়ায় মাটি ধরাইবে। এই মাসে আলুব বীজ পুতিবে। এই মাসের শেষভাগে আশু ধান্য কাটা আরম্ভ হয়।

ভাদ্র—এই মাসেই আশু ধান্য কাটার উপযুক্ত সময়। শীত কালে যে সকল জমিতে ফশল করিতে হইবে এই মাসেই সেই জমিতে সার দিবে। গাছ পাকা নারিকেল চারার জন্য এই মাসেই পুতিতে হয়। এই মাসে ওল তরকারী উঠাইতে আরম্ভ করিবে।

আশ্বিন—এই মাসে কপি, গোল আলু, মূলা প্রভৃতির বীজ বপন করিবে। মানকচুর গাছের গোড়ায় উচা করিয়া ছাই দিবে।

কার্ত্তিক—এই মাসে নানাজাতীয় ঔষধি বৃক্ষ রোপণ করিবে। ফল পাকিলেই যে বৃক্ষ মরিয়া যায় তাহাকে ঔষধি বৃক্ষ কহে। এই মাসে নানাজাতীয় ফুলের গাছের কলম করিবে। এই মাসে মুল্ল, মেথি, কালজিরা, ধনে, কার্পাস, তরমুজ, কাঁকুড়, শশা, উস্তে, পিয়াজ, বরবটী ইত্যাদি এবং নানাজাতীয় কলাইর আবাদ করিবে। পটোলের গেঁড়া সকলও এই মাসে পুতিতে হয়।

অগ্রহায়ণ—কার্ত্তিক মাসে যে সব শাক সবজির গাছ লাগান হয়, তাহার গোড়ায় মাটি খুঁড়িয়া দিবে। এই মাসে মরীচ তুলিতে আরম্ভ করিবে এবং আমন (বাওয়া) ধান এই মাসে যো দেখিয়া কাটিতে আরম্ভ করিবে।

পৌষ—অগ্রহায়ণ মাসে যে ধান্য কাটা হয় নাই। এই মাসে সেই ধান্য কাটিয়া শেষ করিবে। এই মাসের পর আর ধান্যক্ষেত্রে রাখিবে না। শস্যের অনেক বিপদ। শস্য গৃহে না আসিলে বিশ্বাস নাই। এই মাসে আলু তোলা আরম্ভ করিবে। আলু তুলিয়া মটরের মতন ছোট আলু বীজের জন্য রাখিয়া দিবে।

মাঘ—এই মাসই চাসের উপযুক্ত সময়। বৃষ্টি হইলেই চাসের কার্য্য আরম্ভ করিবে। এই মাসে ইক্ষু কাটিতে আরম্ভ করিবে। এই মাসের শেষে হলুদ ও আদা তুলিতে আরম্ভ করিবে। এই মাসে সরিষা তুলিবে ও মাড়িবে।

ফাল্গুন—এই মাসে অরহর, ধনে, যব ও মেথি ইত্যাদি কাটিতে আরম্ভ করিবে। এই মাসে বাঁশ ঝাড়ের গোড়ায় আগুন ধরাইয়া দিবে। ভাবী ফশলের জন্য যে ভূমি মাঘ মাসে চাস করিতে আরম্ভ করিয়াছ তাহা খুব ভাল করিয়া চাস করিবে।

চৈত্র—বৈশাখ মাসে যে সব ফশল রোপণ করিতে উপদেশ করা গিয়াছে। এই মাসে বৃষ্টি হইলেও তাহা রোপণ আরম্ভ করিতে পার। পুরাতন বাঁশ ঝাড়ের গোড়ায় এই মাসে নূতন মাটি দিবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

ধান্য।

জাতিগত বৈষম্যানুসারে ধান্য প্রধানতঃ ৬ ছয় ভাগে বিভক্তঃ—(১) আশু (আউশ), (২) আমন (বাওয়া), (৩) বোর, (৪) দিঘা, (৫) ধাইটা, ও (৬) রাএন্দা। এই সব ধান্য গড়ে যদিও প্রায় বারমাসেই জন্মে তথাপি ধান্যে বর্ষা কৃষি নামে খ্যাত। ঋতু বিভাগ অনুসারে আষাঢ়, শ্রাবণ এই দুই মাস মাত্র বর্ষা কাল। তবে কি কারণে যে ধান্যকে বর্ষা কৃষি বলে ইহার প্রকৃত তথ্য আমরা জানিতে পারি নাই। সম্ভবতঃ ইহাই অনুমেয় যে, বৃষ্টি বর্ষণে ধান্যের উৎকর্ষতা জন্মে বলিয়াই ইহার নাম বর্ষাকৃষি হইয়া থাকিবে।

আশু ধান্য—মাঘ, ফাল্গুন মাসে আউশ জন্মানের ভূমিকে চাস করিতে হয়। চৈত্র মাস মধ্যে আশু ধান্যের ভূমি সমস্তের চাস ও পাইটের কার্য্য শেষ করিতে হইবে। ফাল্গুন হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৫ দিনের মধ্যে আশু ধান্যের বাইনের কার্য্য একেবারে শেষ করা আবশ্যক। বেশী জলা ভূমিতে আশু ধান্য জন্মে না কারণ জলের সঙ্গে সঙ্গে আশু-ধান্যের গাছ বৃদ্ধি পায় না, এইজন্য

অপেক্ষাকৃত উচা ভূমিতে আশু ধান্যের আবাদ করিবে। পতিত ভূমি আবাদ করিলে প্রথম প্রথম আশু ধান্য ফলে ভাল।

আউশ জমি চাস ও উত্তমরূপে পাইট হইলে যো বুঝিয়া আশু ধান্যের বীজ ছড়াইয়া দিবে। এক কোর (প্রায় ৩৷৷ বিঘা) জমিতে কমি বেশীরূপে ভূমির অবস্থানুসারে ন্যূনাধিক ২/ মণ বীজ ধান্য ছড়াইতে হয়। ধান ছড়ান হইলে ক্ষেত্রে মই দিবে। মই দেওনের পর অবস্থামতে স্থান বিশেষে পুনরায় চাস করিবে এবং মই দিবে। অতঃপর যখন অঙ্কুরিত হইয়া দুই তিনটি পাতা উদ্গত হইবে, তখন পুনরায় মই দিবে। ইহার পর বিন্দা দিবে। বিন্দায় যদি ঘাস সমস্ত উঠিয়া না যায়, তবে নিড়াণী দিতে হয়। ধান্যের গাছের মধ্যে ঘাসের গাছ না থাকিলেই ধান্য ভাল ফলিয়া থাকে। কোন কোন দেশে আশু ধান্য ও বাওয়া ধান্য একত্র বুনিয়া থাকে। বাইন অপেক্ষা রোপণে ফশল অধিক হয় এই জন্য কোন কোন স্থানে কচিৎ কোন কৃষক আশু ধান্য রোপণও করিয়া থাকে। রোপণ করিতে কৃষকের পরিশ্রম বেশী। আউশ ধান রোপণ করিতে হইলে পূর্ব্বে ধান্যের জালা ফালাইতে হয়। পরে পর কথিত আমন ধান্যের ন্যায় বপন করিতে হয়। আশু ধান্য শ্রাবণ মাসের মধ্যেই পাকিয়া উঠে। ধান্য ভালরূপ পাকিয়া উঠিলে ধান কাটিয়া মোটা বান্ধিয়া আনিয়া খোলায় রাখিতে হয়। যে স্থানে কৃষকগণ ধান্য প্রভৃতি মলন দেয় তাহাকে খোলা কহে। যাহার ধান্য কম হয় সে পায় পাড়াইয়াও খর হইতে ধান্য বাহির করিয়া লয়। যাহার বেশী ধান্য হয় সে, গরু দ্বারা পাড়াইয়া ধান্য সংগ্রহ করে। ভাল ফশল জন্মিলে এক এক কোর ভূমিতে উর্দ্ধপক্ষে ২৫/ মণ ধান্য

জন্মিতে পারে। আশু ধান্য নানাপ্রকার তন্মধ্যে প্রধান প্রধান গুলির নাম এইঃ——

সূর্য্যমণি, চন্দ্রমণি, কাইশা মুক্তা, রতই, মধুমালতি, গয়াল, মাক বাউশ, ধাইরা, খুকনী, সন্ধ্যামণি, বৈলান, সলৈ, আশুণবাণ, বিন্নাছোপ, কলাথোর, মুছাকাণি, মাধবজটা, কচড়ামুড়ি, নয়ান-ঝুল, নরই, থান্দি, বোয়ালিয়া, ভাদাই, দাবসাইল, যশা, ডুবা-ইল, কালা বকৃরি, আগানি, কালা মইনকা, টেপুশাইল, বলরাগ, জলি, বালু ঘুড়ঘুড়ী, লোহাগাড়া, সুবর্ণখরকা, মরিচফুল, জটাভাদই, নেদিকোর, নলমধু ও সিন্দুরকোচা, জামাই আদরী ইত্যাদি।

আমন (বাওয়া)—আমন ধান্য দুই প্রকারে বপন করা হয়। এক প্রকার বাইন, অপর প্রকার রোয়া। বাইন অপেক্ষা রোয়ার ফশল ফলে বেশী এবং রোয়া জমি অপেক্ষা বাইন জমিতে বীজ ধান্যও বেশী লাগিয়া থাকে। এক বিঘা রোয়া জমিতে দশ সেরের অধিক বীজ বপন করিতে হয় না কিন্তু এক বিঘা বাইন জমিতে প্রায় বার সের বীজ বপন করিতে হয়। রোয়া ও বাইন জমিতে প্রতি বিঘায় দশ মণ হইতে ত্রিশ মণ পর্য্যন্ত ফশল হইয়া থাকে। জলে ডুবা প্রদেশে বাইন ধানের আবাদ বেশী কারণ তথায় হঠাৎ জল আসিয়া ক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া ফালায়। যে সব প্রদেশে জোয়ার ভাটা নাই, বৃষ্টির জলে ফশল হয়, তথায়ই রোয়ার আবাদ অপেক্ষাকৃত বেশী হইয়া থাকে। বাইন জমিকে ৭।৮ বার চাস করিবে, পরে সুন্দররূপ পাইট করিয়া বীজধান ছড়াইয়া দিবে। বীজ ধান ছড়াইবার সময়ে সাবধান থাকিবে যে, যেন কোন স্থানে কম, কোন স্থানে বেশী না পড়ে। ধান বপন করা হইলে বৃষ্টির জলে যদি মাটি চটা বান্ধিয়া উঠে তবে

ক্ষেত্রে আচরা দিয়া দিতে হয়। আচরাতেও যদি ঘাসের গাছ সম্পূর্ণরূপে দূর না হয়, তবে পুরে আবার সেই ক্ষেত্র নিড়াইয়া দিতে হইবে। নিড়ানের পরেও যদি ঘাস না কমে ও ক্ষেত্রে সাঁতার দেওয়ার পরিমাণ জল হয়, তবে কলস বা কলা গাছ অবলম্বনে জলে ভাসিয়া কাঁচিদ্বারা ঘাস কাটিয়া ফেলিতে হয়। এইরূপে ঘাস কাটাকে ডোগান বলে। ফরিদপুর অঞ্চলে এই ডোগানের ব্যবহার বেশী। ঐ জিলায় এবং ঢাকা অঞ্চলের কোন কোন স্থানে আউশ ও বাওয়া একত্র বাইন করে। আউশ ধান্য কর্ত্তন করিয়া আনিবার সময় বাওয়া ধান্যের গাছের পাতাও কর্ত্তিত হইয়া আইসে তাহাতে বাওয়ার কোন ক্ষতি হয় না।

রোয়া—রোয়া বপন করিবার ভূমিতে বর্ষায় জল উঠিতে আরম্ভ হইলে বা বৃষ্টির জল আইল দ্বারা ক্ষেত্রে আবদ্ধ রাখিয়া জলাক্ত ভূমি ২।৩ বার চাস করিতে হয়। পরে "যো" মতে জালার গাছ একটি একটি করিয়া পুতিতে হয়। রোয়া বপনের পূর্ব্বেই জালা প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। জালা প্রস্তুত করি-বার প্রণালী এইরূপঃ—

যে পরিমাণ ভূমিতে জালা ফালান আবশ্যক সেই ভূমিকে ৯।১০ চাস দিয়া মৃত্তিকা খুব ফাস করিতে হয়। উহা বৃষ্টির জলে কর্দ্দমিত না হইলে সেচিয়া জল দিতে হয়। জল দিয়াই কোন কোন স্থানে চাস দেওয়ার প্রথা প্রচলিত। এক বিঘা জমির জন্য দশ সের পরিমিত বীজের জালার প্রয়োজন। বীজ ধান বাশের ডালিতে রাখিয়া সন্ধ্যার সময় জল দ্বারা ভিজাইয়া রাখিতে হয়। প্রাতে কলা বা বচুর পাতায় ঢাকিয়া রাখিবে। ইহাকে ওম দেওয়া কহে। ২।৩ দিন ওম দিলেই বীজ ধানে

অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। পরে তাহা প্রস্তুতীকৃত জালার ক্ষেত্রে ছিটাইয়া ফেলিবে। গাছ এক০ ফুট পরিমাণ দৈর্ঘ্য হইলেই রোপণের উপযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষাকৃত বড়ও ভাল নয়, ছোটও ভাল নয়। এই গাছ উঠাইয়া লইয়া পরে একটি একটি গাছ ক্ষেত্রে রোপণ করিবে। জালা রোপণ করিলে তৎপর আর বিশেষ কোন তদ্বির করিতে হয় না।

অগ্রহায়ণ মাস হইতে বাওয়া ধান্য পাকিতে আরম্ভ হয়। ধান্য পাকিলেই কাটা আরম্ভ করিবে। পৌষ মাসের বেশী আর ধান্য ক্ষেত্রে রাখা কর্ত্তব্য নহে। ধান্য কাটিয়া আনিয়া খোলায় রাখিবে। ধান্যের গাছ হইতে ধান্য পৃথক করিয়া লওয়াকে কোন স্থানে মলন কোন স্থানে মাড়ন কহে। কলিকাতা অঞ্চলে তক্তা বা অন্য দৃঢ় দ্রব্যের উপর ধান্যের সিজা আচরাইয়া ধান্য পৃথক করে। ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষকেরা পা দ্বারা পড়াইয়া গাছ হইতে ধান্য পৃথক করে। ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে গরুদ্বারা পাড়াইয়া গাছ হইতে ধান্য পৃথক করে। প্রতি বিঘা ভূমিতে ১০/ হইতে ১৭ মণ পর্য্যন্ত ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোচবিহার অঞ্চলে একপ্রকার ধান্য আছে। তাহার এক একটী ধান্যের মধ্যে দুই তিনটি করিয়া চাউল থাকে। যে জমিতে বেশী জল হয় সেই জমিতে কাজলা, কুমিরগৈর, ঢেপা, হাসা বাওয়া, লাউডোগ ও আড়াইল প্রভৃতি ধান্য রোপণ করিবে। কারণ এই ধান্য জলের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। যে জমিতে জল বৃদ্ধি পাইয়া পুনরায় জল কমিয়া যায় এইরূপ ভূমিতে কুমিরগৈর ধান্য বপন করিবে। কিম্বা উক্ত প্রকারের কোন ধান্যের সহিত শ্যামরস, পাণিসাইল প্রভৃতি অন্য প্রকারের ধান্য

মিশ্রিত করিয়া বপন করিবে। এইরূপ জমিতে বাইন ভিন্ন রোয়া ভাল হয় না। আমন ধান্য নানা প্রকার। নিম্নে আমরা কয়েক প্রকার আমন ধান্যের নাম উল্লেখ করিলাম।

কাজলা, কুমিরগৈর, বেনাফুল, বাঁশমতি, দলকচু, ঢেপা, হাসা-বাওয়া, লাউডোগ, পারিজাত, চামরমণি, রামসাইল, বেথুলি, গচি, বুন্দরী, কোচপাথরী, সীতাভোগ, পানকাইচ, পেশোয়ারি, লোহাভাঙ্গা, পানিশাইল, খারমা, খাইলাঠী লোনা, বাহুরি, ডহর নাগরা, করিম সাইল, ঝিঙ্গা সাইল, শ্যামরস, কাচর, সাইল শ্যাম-রস, সূর্য্যমণি, মালশিরা, গারো মালদিরা, কুকরী সাইল, মূলা সাইল, ময়ুরসাইল, কৈজোড়, চাপলাস, বনগোটা, জলকরাই, ঘাইটা, কালীজিরা, পরমান্নভোগ, কনকচুর, কলাভোগ, রাজ-ভোগ, বাঁশকাটা, গোপালভোগ, উকনীমধু, দৈলোচ, মুগী, পান-ত্রাস, মুক্তাহার, আধারমাণিক, কৃষ্ণচূড়া, পক্ষীরাজ, চিনিরোওয়া, শৈলেপনা, বেতী, চিত্রা, বয়রা, মালভোগ, বনকোষ, যশা, একুর চাউল, হলদি যাওন, গাইজা, খুদবাদাম, বিন্নী, যোয়ালগাড়া, কেওয়া, বাণীরাজ, নাকিবাওয়া, সেঁচ, লোথা, আড়াইল, পক্ষী-রাজ ও নারিকেল ঝোকা, চিনি শর্করা, ইত্যাদি।

বোরো—এই ধান দুই প্রকার একপ্রকার চৈত্র মাসে পাকে, অন্যপ্রকার জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকে। চৈত্র মাসে যে বোরো পাকে তাহা অপেক্ষাকৃত টানি জমিতেও জন্মে। জ্যৈষ্ঠ মাসে যে বোরো ধান্য পরিপক্ব হয় তাহা নদীর কাঁচিচর ও বিলের কর-চিতে জন্মিয়া থাকে। বোরো ধানের ফলন বেশী কিন্তু চাউল বড় অপরিষ্কার। বোরো ফসলে কৃষক শ্রেণীর বড় উপকার হয়। যেসময়ে কৃষকের পূর্ব্বসঞ্চিত খাওয়া ধান্য শেষ হইয়া পড়ে বোরো

ফসলটাও প্রায় সেই সময়ে হয় সুতরাংই কৃষকের উপকার।

বোরো ধানের ও জালা করিয়া রোয়া ধান্যের ন্যায় বপন করিতে হয়। ক্ষেত্রে গাছ বপনের পর যদি কর্দ্দমিত মাটি শুষ্ক হইয়া উঠে, তবে বিলের জল দোন দ্বারা সেচিয়া ক্ষেত্রে দিবে অন্যথা রৌদ্রে গাছ নষ্ট হইয়া যাইবে। এই ধান্যেরও মলন আমন ধান্যের মলনের ন্যায়।

দিঘা—এই ধান্য জলপ্লাবিত দেশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। জলের সঙ্গে সঙ্গে এই ধান্যের গাছ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। জলে ইহাকে মারিতে পারে না। এই ধান্যের তুষভাগ অন্য ধান্যাপেক্ষা কম। দিঘা ধান্যের আবাদ ঢাকা জিলায় বিক্রমপুরাঞ্চলে অনেক বেশী। চৈত্র, বৈশাখ মাসে এই ধান্য বাইন করিতে হয়। আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসেই ধান্য পাকিয়া উঠে। এই ধান্যের বাইন ও মলন প্রভৃতি আমন ধান্যের ন্যায়।

ষাইটা—এই ধান্য প্রায় সকল দেশেই জন্মে। ষাইট দিনে ধান্য পাকিয়া উঠে বলিয়া এই ধান্যকে ষাইটা ধান কহে। জল প্লাবিত স্থানের ভিটি তুল্য জমিতে এই ধান্য বপন করিবে। আমন বাইন ধান্যের ন্যায় ইহার সকল কার্য্যই করিতে হয়। এই ধান্যের চাউল অর্দ্ধেকের ও কম হয়। এই ধান্যের অপর নাম চেঙ্গরি।

রাএন্দা—এই ধান্য ও বাইন করিতে হয়। এবং আমন বাইন ধান্যের ন্যায় ইন্দুর মলনাদি দিতে হয়। এই ধান্য প্রায় নয় মাসে পরিপক্ক হয়। মাঘ ও ফাল্গুন মাসে এই ধান্য বাইন করিবে। আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে পাকে। এই ধান্যের চাউল অর্দ্ধেকের ও কম হয়।

সকল প্রকার ধান্যেরই কাটিবার সময় অগ্রভাগ কাটিয়া আনিবে। গরুর জন্য গাছের মধ্যভাগ কাটিয়া আনিবে। নিম্ন ভাগ যাহা ক্ষেত্রে থাকিবে, তাহা জ্বালানের জন্য না আনিয়া ক্ষেত্রে পুরিয়া ফালান উচিত। কারণ তাহাতে ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

গম।

গমের অপর নাম গোধূম। পূর্ব্ব বাঙ্গলায় গমের আবাদ বে কম। রসযুক্ত ভূমিতে গম ভাল জন্মে না। দোয়াশ মৃত্তিকার মধ্যে যাহার আঠাল ভাগ কিছু বেশী তাহাই গম উৎপাদনের জন্য উত্তম। গম উৎপাদন জন্য গোময় সার উৎকৃষ্ট। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে গমের জন্য ভূমিকর্ষণ করিবে; ১০।১২ চাসের কমে গমের ভূমি পাইট হয় না। অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যেই বীজ গম ক্ষেত্রে বুনিতে হয়। এক বিঘা পরিমিত ভূমিতে ।৬ যোল সের পরিমাণ বীজ বপন করিবে। বীজ গম বাইন করিবার পূর্ব্বে বীজগুলিকে একখান ধারি বা চাটাইয়ের উপর ছড়াইয়া দিবে। পরে ঈষদুষ্ণ জলের সহিত কিঞ্চিৎ তুতিয়া মিশ্রিত করিয়া বীজের উপর ছিটাইয়া দিবে এবং মধ্যে মধ্যে বীজগুলি উলট্ পালট্ করিয়া দিবে। এইরূপ করিয়া প্রহরেকের মধ্যেই ক্ষেত্রে বাইন করিবে। ক্ষেত্রে বীজ বাইন হইলে মই দ্বারা বীজগুলিকে মৃত্তিকার নিম্নে প্রবেশ করাইয়া দিবে। তৎপর সাজিমাটি ও খৈলচূর্ণ সমপরিমাণ ছাইয়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্ষেত্রে ছিটাইয়া দিবে। ইহার পরও একবার মই দেওয়ার

দরকার। ছাই সহ সাজি মাটি ও তৈল দিলে যেমন সারের কার্য্য করে তেমন বীজগুলি সত্বরে অঙ্কুরিত হয়। বীজে উষ্ণ জল সহকারে তুতিয়া দেওয়ায় ক্ষেত্রে পোকা জন্মে না। প্রতি বিঘা ভূমিতে ৬।৭ মণ ফশল জন্মিয়া থাকে। গমের কাটন ও মলন কার্য্যও প্রায় ধান্যের ন্যায়।

সরিষা।

সরিষা একটি প্রধান ফশল। কোন কোন স্থানে সরিষাকে মাল কহে। সরিষা বৎসরের মধ্যে দুই সময়ে জন্মে; মাঘ মাসে ও চৈত্র মাসে। এই জন্য সরিষা মাঘি ও চৈত্রা এই দুই নামে খ্যাত। রঙ্গের বিভিন্নতায় লাই, শ্বেতি ও কাজলি বলিয়া ইহার বিভিন্ন নাম আছে। সরিষা সকল প্রদেশেই কমি বেশী পরিমাণে জন্মে। পলি মৃত্তিকা সরিষার জন্য উত্তম। নদ নদী ও ঝর্ণার তীরবর্ত্তী ভূমি ও বিলের কিনারায় বর্ষার জলে অধিক পরিমাণে পলি মাটি পড়ে এবং যে সব স্থান বর্ষার জলে জলমগ্ন হয় তাহাতে পলি মাটি প্রচুর পরিমাণে পড়িয়া থাকে সুতরাং ঐরূপ ভূমিতেই সরিষা বপন করিবে। জলমগ্ন ভূমিতে এত পলল পড়ে যে তাহাতে আর সার দিতে বা চাস করিতে হয় না। মৃত্তিকা নরম থাকিতে বীজ সরিষা ছিটাইয়া দিলেই বেশ সরিষা জন্মিয়া থাকে। লাই সরিষা এইরূপ ভূমিতেই জন্মে। এই সরিষার গাছ ২ হইতে ৩।০ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে এবং ডাল ও জন্মে। এই জাতীয় সরিষার তৈল কিছু কম হয়।

লাই ভিন্ন অন্য জাতীয় সরিষা দোয়াশ মৃত্তিকায় জন্মিয়া

থাকে। এই মৃত্তিকার মধ্যে যদি বালুর ভাগ বেশী থাকে, তবে সরিষা জন্মে ভাল। এই সব ক্ষেত্রে ১০।১১ বার চাস দিতে হয় এবং সার দেওয়াও প্রয়োজন। প্রতি বিঘায় ২০।২৫ মণ পর্য্যন্ত গোবর সার দিলেই প্রচুর। আশ্বিন মাসে সরিষার ক্ষেত্র চাস করিয়া কার্ত্তিক মাসে বীজ বপন করিবে। এই সরিষা মাঘি সরিষা, ইহার গাছ বেশী উচ্চ হয় না। ৩।৪টি পত্র বাহির হইলেই ফুল উৎপন্ন হইয়া ছড়া বাহির হইতে থাকে।

প্রতি বিঘা ভূমিতে /১ কি /১। সের পরিমিত বীজ সরিষা বুনিতে হয়। বীজ সরিষা বুননের পূর্ব্বে ঈষদুষ্ণ জল দ্বারা বীজগুলিকে সিক্ত করিয়া লইবে। বীজ বপন হইলে ১ বার কি ২ বার চাস করিবে তাহাতে বীজ সরিষা কিছু মৃত্তিকার নীচে পড়িবে। বীজ বাইন করিয়া অল্পোষ্ণ জলে অল্প পরিমাণ হিরাকষ মিশ্রিত করিয়া ক্ষেত্রে ছিটাইয়া দিলে সরিষার গাছ পোকায় ধরে না। প্রত্যেক কৃষকের ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সরিষা গাছ ঘন হইয়া উঠিলে নিড়ানি দিয়া মধ্য মধ্য হইতে গাছ উঠাইয়া ফেলিবে। পৌষ ও মাঘ মাসে যদি বৃষ্টি না হয় তবে ক্ষেত্রে কিছু জল দিতে পাড়িলে বীজ পুষ্ট হয়।

সরিষা অপক্কাবস্থায় উঠান মন্দ, বেশী পক্ক অবস্থায় উঠাইলেও ছড়া ফাটিয়া সরিষা পড়িয়া যায় অতএব খুব সাবধানের সহিত সময় বুঝিয়া গাছ তুলিবে। গাছ বাটীতে খোলায় আনিয়া একদিকে গাছের গোড়া রাখিয়া পালা দিবে। ইহাকে জাঁক কহে। এই জাঁক ২।৩ বা ততোধিক দিবস রাখিয়া গাছগুলিকে ছড়াইয়া দিবে। কিছু রৌদ্র লাগিলে বক্ষী দ্বারা বাড়ি দিলেই সরিষা বাহির হয়। পরে গাছগুলিকে পৃথক করিয়া

সরিষা ঝাড়িয়া লইবে। এই সরিষা গাছের ভস্ম ভূমির পক্ষে সার। সরিষা অবস্থা বিবেচনায় প্রতি বিঘায় ৮ হইতে ১২/ মণ পর্য্যন্ত জন্মিয়া থাকে।

তিল।

তিল দুই প্রকার—কৃষ্ণ তিল ও পাণ্ডু তিল। প্রায় সকল মৃত্তিকায়ই তিল জন্মে, তবে যে ভূমিতে জ্যৈষ্ঠ মাসে জল বদ্ধ না হয় এমত ভূমিতেই তিল বপন করিবে। কারণ জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ব্বে তিল পক্ক হয় না। তিল বৃক্ষের গোয়ার জল বদ্ধ হইলে গাছ মরিয়া যায়।

যে ভূমিতে তিল বপন করিবে, ঐ ক্ষেত্রকে মাঘ ও ফাল্গুন মাসে অন্ততঃ তিনবার চাস করিবে, পরে চৈত্র মাসে পুনরায় ২।৩ তিন চাস দিয়া তিল বাইন করিবে। সাধারণ লোকে বলেঃ—

"ফাল্গুনে চৈত্রে করিবে চাস
তবে গিয়ে কৃষকের হাস।"

তিল ক্ষেত্র অধিক গভীর করিয়া চাস দেওয়ার প্রয়োজননাই। তিল ক্ষেত্রের জন্য গোবর ও ভস্মই উত্তম সার। ক্ষেত্র কর্ষিত ও ক্ষেত্রে সার দেওয়া হইলে বীজ বপন করিবে। প্রতি বিঘায় উদ্ধ সংখ্যায় /২ সের বীজ বপন করিবে। এক বিঘা ভূমিতে বেশীর পক্ষে ১৮/ মণ পর্য্যন্ত তিল জন্মিতে পারে।

কোন পাত্রে বীজ তিল ১ দিন জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে চাচ বা ধারীর উপর ঐ তিল বিছাইয়া তদুপরি ছাই ছড়াইয়া দিবে, এইভাবে এক দিন ছায়ায় শুষ্ক করতঃ পরে প্রস্তুতীকৃত

ক্ষেত্রে বপন করিবে। চারাগুলি ৪।৫ অঙ্গুলি পরিমাণ দীর্ঘ হইলে ক্ষেত্রে আচরা দিবে। অচিরাতেও যদি জঙ্গলা ও ঘাস দুর না হয় এবং প্রত্যেক চারা যদি ১০ অঙ্গুলি পরিমাণ ব্যবধানে না পড়ে তবে ক্ষেত্রে নিড়ানী দিতে হইবে।

কোন কোন স্থানে আউশ ধান্য ও তিল একত্র বপন করিবার প্রথা আছে, উক্ত প্রথা কৃষক মাত্রেরই পরিত্যাগ করা উচিত কারণ তাহাতে কি আউশ ধান কি তিল কিছুই ভাল হয় না।

তিল পাকিলে গোড়া সমেত গাছ কাটিয়া খোলায় আনিয়া পালা দিবে। সরিষার ন্যায় গাছের অগ্রভাগ এক দিকে রাখিয়া গোল করিয়া পালা দিবে। অগ্রভাগ গুলি পালার মধ্যে রাখিবে। অন্যথা বৃষ্টি ও বাতাস লাগিয়া তিলের রং খারাপ হয়। গাছ গুলিকে ৫।৬ দিন পালায় রাখিয়া ছড়াইয়া দিবে। রৌদ্রে শুষ্ক হইলে লাঠিদ্বারা বাড়ীদিলেই তিল গাছ হইতে পৃথক হইয়া মাটিতে পড়ে। পরে উত্তম প্রকারে ঝাড়িয়া শুষ্ক করিয়া রাখিয়া দিবে।

তিসী।

তিসী অযত্নে অনুর্ব্বর ক্ষেত্রেও জন্মিয়া থাকে অথচ লাভ ও বেশ কিন্তু এতদ্দেশীয় কৃষকদের তিসীর আবাদে মনোযোগ মাত্রেও নাই। বালুরভাগ বেশী এইরূপ মৃত্তিকাতেই তিসী ভালরূপ জন্মে, যে ক্ষেত্রে অন্য কৃষি ভালরূপ জন্মে না এইরূপ ক্ষেত্রে তিসী বাইন করাই কর্ত্তব্য। তিসীর ক্ষেত্রে ৩।৪ চাস দিলেই হয়। বেশী সারযুক্ত ক্ষেত্রে তিসী ভাল হয় না, এইজন্য কৃষকগণ তিসীর ক্ষেত্রে সার দেয় না।

তিসী দুই প্রকারে ব্যবহৃত হয়। বীচিতে তৈল জন্মে এবং গাছের ছালে শণ ও পাটের ন্যায় আঁশ জন্মে। এই আঁশ বেশ শক্ত! তিসীর আঁশ ১০৲, ১১৲ টাকা মণ বিক্রয় হয়।

প্রতি বিঘা ভূমিতে /১ সের /১॥ সের বীজ বাইন করিতে হয়। বীচির জন্য যাহারা তিসী বপন করিবে তাহারা গাছ গুলিকে ফাক ফাক করিয়া দিবে। আর যাহারা আঁশের জন্য তিসীর আবাদ করিবে তাহারা গাছ ঘন করিলেও দোষ নাই।

বীজ তিসীতে পূর্ব্ব দিন একটুক উষ্ণ জলের ছিটা দিয়া চাচ বা ধারীতে ছড়াইয়া রাখিয়া পরদিন শেষ বেলা বাইন করিয়া সরিষার ন্যায় এক কি দুই চাষ দিবে। তিসীর ক্ষেত্রেও তিলের ক্ষেত্রের ন্যায় নিড়ানী দিবে। তিসী পরিপক হইলে গাছ কাটিয়া আনিয়া রৌদ্রে অত্যন্ত শুষ্ককরতঃ ধান্যের ন্যায় গরুদ্বারা পাড়াইয়া তিসী বাহির করিয়া লইবে। প্রতি বিঘায় ৭।৮/ মণ তিসী জন্মে।

যাহারা আঁশের জন্য তিসীর আবাদ করিবে তাহারা ফুল হইলেই গাছ কাটিয়া জলে পচাইবে পরে পরের লিখিত পাট ও শণের ন্যায় আশ লইবে। একবিঘা ভূমির তিসী গাছেতে প্রায় ২/ মণ আঁশ জন্মে।

পাট।

পাটের অপর নাম নালিয়া। আজকাল এদেশে পাটের যথেষ্ট আদর। কৃষকেরা এই জন্য পাটের আবাদ অধিক পরিমাণে করিয়া থাকে। পাটকে কৃষকগণ এত ভালবাসে যে, সুরসিক কৃষকগণ "নাইলার সম কৃষি নাইরে ভাই।" ইত্যাদি সঙ্গীত পর্য্যন্ত আহ্লাদে গান করিয়া থাকে।

পাট জন্মানের জন্ত দোয়াশ মৃত্তিকাই খুব ভাল। বর্ষার জলে পলি পড়ে এমত মৃত্তিকায় পাট আবাদ করিতে হইলে আর সার দেওয়ার প্রয়োজন করে না। যে জমিতে পলন পড়ে না এমত জমিতে পাট আবাদ করিতে হইলে ভূমিতে সার দিতে হয়। গোবরের সারই পাটের ভূমির জন্ত প্রশস্থ। টান জমি ও ডুবা জমি উভয় জমিতেই পাট জন্মে।

মাঘ কি ফাল্গুন মাসে যো বুঝিয়া পাটের ভূমি চাস করিবে। সাত আট চাসের কমে পাটের ভূমি বাইনের যোগ্য হয় না। চৈত্র মাসে বৃষ্টি হইলেই পাটের বীজ বাইন করিবে। প্রতি বিঘা ভূমিতে /২॥ সের /৩ সেরের বেশী বীজের দরকার হয় না। সুবিধার অভাব হইলে অনেকে বৈশাখ মাসেও বাইন করিয়া থাকে।

পাট গাছ অৰ্দ্ধ হস্ত পরিমিত হইলেই আচড়া (বিন্দা) দিয়া নিড়ানী দিবে। নিড়ানী ভিন্ন পাঠ ভাল হয় না। এমতভাবে নিড়ানী দিতে হইবে যে, ৪।৬ অঙ্গুলি ব্যবধানে এক একটি গাছ থাকে। শ্রাবণ হইতে ভাদ্র মাসের মধ্যে পাটের গাছ কাটিবে। কতকগুলি গাছে এক এক আটি বান্ধিয়া তাহার কতকগুলি আটি একত্র করিয়া জলে ভিজাইবে। ঐ একত্রিত আটিগুলির উপর কোন ভাড় বস্তু চাপা দিবে। এইরূপ পাট ভিজানকে যাক কহে। বদ্ধ জলে যাক ভাল হয়। ১০।১২ দিনের কমে পাট পচে না। বেশী পচিলে পাট ভাল হয় না।

পাট পচিলে পরে প্রত্যেক গাছের গোড়া হইতে ছালগুলি উঠাইয়া ছোট ছোট মুঠা বান্ধিবে। ঐ মুঠা প্রত্যেক জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরিষ্কার জলে আছরাইয়া ধৌত করতঃ শুষ্ক করিলেই পাট প্রস্তুত হইল। এইরূপ লওয়া পাটের দানা ভাল

হয়, সোলা ভাঙ্গিয়া পাট লওয়ার অন্যরূপ প্রথা আছে, এই প্রথায় পাটের দানা ভাল হয় না। এইদানা কিন্তু বীজ নহে। সোলা ভাঙ্গা পাটের মূল্যও কম।

প্রতি বিঘায় ১৫ হইতে ২০/ মণ পর্য্যন্ত পাট জন্মিয়া থাকে।

দানা পরিপক্ক না হইতেই গাছ কাটিয়া যাক দিতে হইবে। গাছ পাকিলে পাট ভাল হয় না। বীজের জন্য কতক গাছ ক্ষেত্রেই রাখিয়া দিতে হয়। পাটের সরু গাছ খুব পরিপক্ক হইলে কাটিয়া রাখিয়া দিবে। পরে ঐ গাছের ছাল দ্বারা গোশালা ইত্যাদি বান্ধিলে তাহা সাধারণ পাটের বান্ধ হইতে দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকে।

শণ।

পলল ময় ভূমি ও যে ভূমিতে বৃক্ষাদির গলিত সার থাকে সেই ভূমিতে শণ ভাল হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে আর পৃথক সার দিতে হয় না। অন্য প্রকার ভূমিতে যে কৃষক শণ আবাদ করিতে ইচ্ছা করে তাহার ভূমিতে অল্প পরিমাণ গোবর ও ছাই দেওয়া উচিত। শণ আবাদের ক্ষেত্রে ১৫।১৬ চাষের কম পাইট হয় না। শণের গাছ ঘন ঘন হওয়াই ভাল; শণের মধ্যে নিড়ানী দেওয়া সুবিধা জনক নহে। অতএব চাষের সময়ই ঘাসের মূল ইত্যাদি ভাল করিয়া ফেলিয়া দিবে। আশ্বিন হইতে কার্ত্তিকের মধ্যে বাইন করিবে। গাছ পরিপক্ক হইবার পূর্ব্বেই গাছ কাটিবে। শণের গাছও পাটের ন্যায় যাক দিবে। উত্তম রূপ গাছ পচিলে ছোট ছোট কৈঞ্চার দ্বারা জলের উপর গাছ গুলি

বাইড়াইবে। পরে কাষ্ঠ ভাগ ছাড়াইয়া ধুইয়া শুষ্ক করিয়া লইলেই শণ প্রস্তুত হইল। প্রতি বিঘায় ৭ হইতে ৮ মন শণ জন্মিয়া থাকে। বীজ রাখিতে হইলে কতক গাছ একেবারে পরিপক্ক করিতে হয়।

আদা।

যে স্থান জলে ডুবিয়া যায়, সেই ভূমিতে আদা জন্মে না। আদা একরূপ স্থলচর উদ্ভিদ। আদার জন্য দোয়াশ ভূমিই উপযুক্ত। আদার ভূমিতে সচরাচর কৃষকেরা সার দেয় না। চারা বপনের মাসেক কাল পূর্ব্বে প্রতি বিঘায় অর্দ্ধ মন পরিমাণ চুনা দিলে আদা উত্তমজন্মে। আদার ক্ষেত্রে ১০।১২ চাষ দিবে। মৃত্তিকাকে ধূলার ন্যায় চূর্ণ করিবে। বৈশাখ মাসের শেষ জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম ক্ষেত্রে ১ হাত ব্যবধানে সাইর বান্দিবে। ২।৩টি চোখ থাকে এইরূপে আদার খণ্ড করিয়া অর্দ্ধ হস্ত ব্যবধানে ঐ খণ্ড আদা রোপণ করিবে। বীজ আদা অনেক মাটির নীচে দিবে না। কালানুযায়ী যে বৃষ্টি হয় ঐ জলই আদার পোষক। সাইরের মধ্যে জল বদ্ধ হইলে জোল কাটিয়া তাহা বাহির করিয়া দিবে। ৫।৬ অঙ্গুলি পরিমাণ গাছ হইলে সাইরের মধ্যের মৃত্তিকা উঠাইয়া গাছের গোড়ায় দিবে। শীত ঋতুর প্রথমেই গাছ মরিতে আরম্ভ হয়, তখন আদা উঠাইতে আরম্ভ করিবে। আদা ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য আর কিছু করিতে হয় না।

হরিদ্রা ।

হরিদ্রার চাষ, বীজ বপন, কেশল উত্তোলনের নিয়ম ঠিক আদার ন্যায়। হরিদ্রা ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য আর ও একটি কার্য্য করিতে হয়। হরিদ্রা কোন কোন স্থলে কাঁচা ব্যবহৃত হয়। শুষ্ক ব্যবহার করিতে হইলে কাঁচা হরিদ্রাকে গোবর জলে সিদ্ধ করিয়া আনাম বা দা দ্বারা চিড়িয়া শুষ্ক করিয়া রাখিতে হয়। শুষ্ক হরিদ্রাই ভিন্ন দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

এরারূট ।

এরারূটের ভূমি কর্ষণ ও বীজ রোপণের প্রণালী ইত্যাদি ঠিক আদা ও হরিদ্রার ন্যায়। এরারূট মাঘ মাসের শেষ ফাল্গুন মাসের প্রথমে উঠাইতে হয়। এরারূট সাজিতে করিয়া পরিষ্কার জলে ভাল রূপে ধৌত করিবে। পরে উহা ঢেঁকিতে উত্তমরূপে কুটিয়া চূর্ণ করিবে। ঐ চূর্ণ বড় বড় গামলায় জল দিয়া গুলিবে। ঐ গোলা জল কাপড়ে ছাঁকিবে। পুনরায় ঐ ছাঁক গুলিকে আবার ঐরূপ করিবে। ছাকা জলের নিম্নে কিছুক্ষণ পরেই ধবল বর্ণ সার পদার্থ জন্মে। ঐ ধবল পদার্থ বিশুদ্ধ জলে উক্ত প্রণালীতে পুনঃ পুনঃ ধৌত করিবে। এই ভাবে যে সার পদার্থ পাওয়া যায় তাহা রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলেই এরারূট হইল, ভিজা এরারূট শুষ্ক করিবার সময় মৃত্তিকা হইতে উপরে শুষ্ক করিবে। মাচা করিয়া লইলেই ভাল। মাচার উপর শুষ্ক করিতেও এরারূটের উপর পাতলা কাপর ঢাকা দিবে। কারণ তাহাতে ধুলা বালি পড়িবে না।

এরারুট কেবল পথ্যে ব্যবহৃত হয় না। এরারুটের দ্বারা সিন্দুর এবং আবিরও হইয়া থাকে। উহা প্রস্তুত প্রণালীর সহিত কৃষকের সম্বন্ধ খুব কম সুতরাং আমরা সেই প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিলাম।

শঠি।

শঠি অযত্নেই প্রচুর জন্মে, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, রংপুর প্রভৃতি জিলার পতিত ভূমিতে ও ভূমির বাতরে ইহা প্রচুর জন্মে। শঠি কিরূপে ব্যবহৃত হয় তাহা অনেকে জানে না সুতরাং শঠির আদর খুব কম। এরারুটের ন্যায় শঠি হইতে একরূপ পদার্থ বাহির হয় তাহাকে পালো কহে। পরিষ্কার পালো দ্বারা রুটি ও বিবিধ পিষ্টক প্রস্তুত হয়। তাহা খাইতেও ভাল। এবং শঠি দ্বারা আবির প্রস্তুত হইয়া থাকে পূর্ব্বোল্লিখিত জিলায় যদি কেহ শঠির দ্বারা পালো প্রস্তুত করেন, তবে বোধ হয় বেশ লাভবান হইতে পারেন। শঠিকে কোন কোন দেশে বন হরিদ্রা কহে।

কার্পাস।

কার্পাস তুলা নানা জাতীয়। আমিরিকান, দেশী ও কোটাজি। মিশরের কার্পাস খুব সরস কিন্তু এ দেশে তাহার প্রায় আবাদ হয় না। কোটাজি কার্পাসের ও রীতিমত আবাদ এ দেশে নাই। ইহার গাছ বড় বড় হয়। গৃহস্থের বাড়ীতে

২। ৪ টি গাছ দৃষ্ট হয় মাত্র। দেশী কার্পাসই এ দেশে হইয়া থাকে। পূর্ব্ব বাঙ্গালার গোহরাইল পাহাড় প্রদেশে সুধারাম ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট ও আসাম প্রভৃতি স্থানে দেশী কার্পাসের আবাদ হইয়া থাকে। এই কার্পাসের গাছ ছোট ছোট হয়। দেশী কার্পাস হৈমন্তিক ও বর্ষা দুই ভাগে বিভক্ত। হৈমন্তিক কার্পাসের বীজ কার্ত্তিক মাসে এবং বর্ষা কার্পাসের বীজ বৈশাখ মাসে রোপণ করিতে হয়। উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত স্থান ও পর্ব্বত ময় স্থানে কার্পাস ভাল জন্মে। দোয়াশ মৃত্তিকার মধ্যে যাহাতে আঠাল ভাগ বেশী থাকে তাহাতেই কার্পাস উৎকৃষ্ট হয়।

কার্পাস বৃক্ষের মূল প্রায় ১ হাত মৃত্তিকার নিম্ন দেশ পর্যান্ত যায়। অতএব কার্পাস ক্ষেত্র অন্ততঃ ১ কি ১। সোয়া ফুট গভীর করিয়া খনন করিতে হয়। কার্পাসের ভূমি পুনঃ পুনঃ চাষ করিয়া সুন্দররূপে পাইট করিতে হইবে। তুলার ক্ষেত্র চাষ সম্বন্ধে প্রবাদ এই——

"শতেক চাষে মূলা।
তার অর্দ্ধেকে তুলা॥"

বাস্তবিক তুলার ভূমি অত্যন্ত চাষের আবশ্যক। কম চাষে তুলা ভাল জন্মে না।

কার্পাসের বীজ রোপণের পূর্ব্বে বীজগুলিকে জলে ভিজাইয়া রাখিবে। প্রায় এক প্রহর কাল ভিজিলে পর দানাগুলি জল ঝাড়িয়া উঠাইবে, পরে দানাগুলিকে ছালার উপর ঘষিবে। এইরূপ ঘর্ষণে সহজে অল্প সময়ে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। ঘষা দানা সোরা মিশ্রিত জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। সোরা না মিলিলে ঘোটকের মূত্রে ভিজাইলেও হয়। এইভাবে ১ দিন ভিজাইলেই

যথেষ্ঠ। ইহার পরই ঐ দানা বপন করিবে। প্রতি বিঘা ভূমির জন্য /২।০ সের /২॥০ সেরের বেশী দানার প্রয়োজন করে না। কেহ পাইট করিয়া ক্ষেত্রে বীজ ছড়াইয়া ফেলে, কেহ ক্ষেত্রে আইল বান্ধিয়া অর্দ্ধহস্ত অন্তরে অন্তরে একখানা কাঠি দ্বারা গর্ত্ত করিয়া ঐ গর্ত্তে ২।৩টি করিয়া দানা পুড়িয়া উপরে মাটি দিয়া রাখিবে। অনাবৃষ্টি হইলে গাছ কিছু বড় না হওয়া পর্য্যন্ত কিছু কিছু জল গাছের গোড়ায় দিবে। যেসব গাছ দুর্ব্বল থাকে তাহা উঠাইয়া ফেলিবে। আশ্বিন মাসে কার্পাস ফুটিতে আরম্ভ হয়। কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত ফুটিতেই থাকে। একদিন পর একদিন কার্পাস তুলিবে। প্রতি বিঘা ভূমিতে ন্যূনাধিক ৭/ মণ কার্পাস জন্মিয়া থাকে।

কার্পাস কৃষির প্রতি এদেশের কৃষকশ্রেণীর যত্ন খুব কম। গারো, হাজঙ্গ, নাগা, খাসিয়া, মুণিপুরি, বানাই ও কোচ প্রভৃতি জাতিরাই কার্পাসের কৃষি করিয়া থাকে। কার্পাসের সঙ্গে দানা থাকে, ঐ দানা পৃথক করিলেই তুলা হয়। কার্পাস হইতে দানা পৃথক করিবার জন্য কৃষকগণ ভাল কোন কল কৌশল জানে না। ইহাদের মধ্যে কেহ ঐ সম্বন্ধে কোন কল পাইলে কার্পাসের কৃষি করিয়া ইহারা লাভবান হইতে পারে। পাকা কার্পাস তুলাসহ বীজের জন্য রাখাই উচিত। এই তুলাযুক্ত বীজকে কোন কোন স্থানে মা কার্পাস ও অন্য কার্পাসকে ছা কার্পাস বলিয়া থাকে।

তামাক।

তামাক নানা প্রকার। এদেশে আসাম প্রদেশের তামাক ভাল বলিয়া প্রসিদ্ধ। তামাক নানা প্রকার তন্মধ্যে চামা, ডেলেঙ্গি, হিঙ্গুলি, নাওখোল, সিন্দুর ঘটুয়া, হাতি কাণি, শকুন কাণি ও কালীজীবে প্রভৃতি প্রধান। ময়মনসিংহ জিলায় এক রূপ তামাক জন্মে তাহাকে বিলাতি তামাক কহে। কি কারণে যে এই তামাকের নাম বিলাতি তামাক হইল তাহার কোন ঐতিহাসিক তত্ত্ব আমরা অনুসন্ধানেও পাইনাই, দোয়াশ মৃত্তিকায় তামাক ভাল জন্মে।

বৈশাখ মাস হইতেই তামাকের জমি চাষ ও জঙ্গলা পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিবে। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে যে চাষ দিবে তখন সারও দিবে। তামাকের ভূমির জন্য লবণ ও সোরা ভাল সার। এই সারে ব্যয় বেশী অতএব আমাদের দেশীয় দরিদ্র কৃষকের জন্য এই সার ভাল বোধ হয় না। যে স্থানে নীল জন্মে, তথায় নীলপাতা পচা তামাক ক্ষেত্রের ভাল সার। যে স্থানে নীলপাতা না ঘটে, তথাকার কৃষকগণকে গোবরও সরিষার তৈল সাররূপে ব্যবহার করিতে আমরা পরামর্শ প্রদান করি। ক্ষেত্রে সার দিয়া ৮।১০ খান চাষ দিবে এবং মই দিয়া জঙ্গলাদি পরিষ্কার করিবে। ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে তামাকের বীজ কেহ কেহ একেবারেই বপন করিবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। এই প্রণালীতে কিছু দোষ আছে। অন্য স্থানে চারা করিয়া ঐ চারা উঠাইয়া আনিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করাকেই আমরা সন্দেহ মনে করি।

ভাদ্র মাসে কি আশ্বিন মাসের প্রথমে চারা করিবার জন্য কতক স্থান উত্তমরূপে চূর্ণ ও পরিষ্কার করিবে। এই বীজ বপ-

নের স্থানকে হাতী পিঠা করিবে। কারণ তাহাতে ক্ষেত্রে বৃষ্টির জল আবদ্ধ হইয়া দানা পচিবেনা। তামাকের দানা বড়ই ক্ষুদ্র। স্থানের পরিমাণ মতে দানা একখান কাপরের কানিতে বান্ধিয়া অল্প সোরা মিশ্রিত জলে ভিজাইয়া রাখিবে। ৫।৬ ঘণ্টা পরে ঐ বীজ বুনিয়া ফেলিবে। যে স্থানে বীজ বুনিবে। তাহার উপর এক কি দেড় হাত উচ্চ করিয়া একখান খরের চালা বান্ধিয়া দিবে। ইহাতে বৃষ্টির জলেও তাপাধিক্যে কোন ক্ষতি করিবে না। এই চালা রাত্রিতে খুলিয়া ফেলিবে আবার প্রাতে দিবে। এবং মধ্যে মধ্যে জল দিবে। অঙ্কুর উৎপন্ন হইলেও মধ্যে মধ্যে জল দিবে। চারার তিন চারিটি পাতা হইলেই সারি সারি ক্রমে ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। চারা সকল ক্ষেত্রে লাগিলে গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া দিবে। গাছের গোরায় গোবর দিলে গাছ বেশ সতেজ হইবে। এক একটি পাতার গোড়ায় যে ডেম উঠে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। কৃষকের ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। গাছে যখন ৮।১০ পাতা হইবে তখন গাছের অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া দিবে এবং গোরায় ২।৩টি পাতা ছিড়িয়া ফেলিবে, তাহা বিষপাত নামে খ্যাত।

মাঘ মাসে পাতা কাটিতে আরম্ভ করিবে। গাছের ছালসহ পাতা কাটিতে হয়, কেহ কেহবা গাছের কিয়দংশ ছালসহ পাতা কাটিয়া থাকে। পাতা কাটিয়া ২।৩ দিন ক্ষেত্রেই রাখিবে। শীলাবৃষ্টির আশঙ্কা দেখিলে অবশ্য ঘরে নিতে হইবে। তামাক পাতা দড়িতে বান্ধিয়া ঝুলাইয়া শুষ্ক করিতে দিবে। এরূপ ভাবে শুষ্ক করিতে দিবে যে, যেন রাত্রিতে শিশিরও দিনে রৌদ্র

লাগে কিন্তু সাবধান থাকিবে যেন বৃষ্টি না লাগে। এইভাবে তামাকপাতা শুষ্ক হইলে "জাক্" দিবে। একখান মইয়ের উপর পাতাগুলি স্তরে স্তরে সাজাইবে। এইরূপ ভাবে সাজাইবে যেন পাতার ডাটগুলি বাহিরের দিকে থাকে। পরে পাতার উপর একটা বাঁশ দিয়া মইয়ের সহিত চাপিয়া বান্ধিবে। এই বান্ধাকে কৃষকগণ জাক কহে। পাতা "জাক" দিয়া রৌদ্রে দিবে। ঝুলাইয়া রৌদ্রে দেওয়াই উচিত। এইভাবে ৩।৪ দিন রৌদ্র পাইলে মই হইতে খুলিয়া মোঠা বান্দিবে। রৌদ্রের মধ্যে মোটা বান্ধিবে না। রাত্রিতে বান্ধাই সুপ্রথা। মোঠাগুলির ডাটা বাহিরে রাখিয়া ঘরের মধ্যে গোলাকারে পালা দিয়া রাখিবে। কোন কোন কৃষক পালা দেওয়ার ১০।১২ দিন পর পাতার মোঠা বাহির করিয়া খর বা ছালা দিয়া বান্ধিয়া রাখে। তাহাতে তামাক ভাল থাকে। প্রতি বিঘা ভূমিতে ৪।৫ মণ তামাক হইয়া থাকে।

ইক্ষু।

ইক্ষুকে কোন স্থানে আক, কোন স্থানে কুশাইর কহে। ইক্ষুর চাষ পাটনা, গাজিপুর আরা জিলায় প্রচুর হয়। এভিন্ন অন্য সকল বিভাগেই হইয়া থাকে। সকল ভূমিতেই ইক্ষু জন্মে। ইক্ষুর আবাদ প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার তন্মধ্যে যে প্রণালী আমরা ভাল বোধ করিতেছি, তাহাই এস্থলে উল্লেখ করিলাম।

ইক্ষুর অগ্র ভাগের কতক অংশ কর্দ্দমিত ছায়া বিশিষ্ট স্থানে

পুতিয়া রাখিবে। কিছু দিনপর দেখিবে ইহার প্রত্যেক চোক হইতেই এক একটি গাছ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাই ইক্ষুর বীজ। যে ভূমিতে ইক্ষুর আবাদ করিবে সেই ভূমি পূর্ব্ব সন পতিত রাখিবে। কার্ত্তিক মাস হইতে ভূমি চাষ করিতে আরম্ভ করিবে। মাঘ মাস পর্য্যন্ত মাসে মাসেই চাষ করিবে। ফাল্গুন মাসে কর্ষিত ক্ষেত্রে গোবরের সার দিয়া কর্ষণ করিবে এবং মই দিবে। জ্যৈষ্ঠ মাসে কিছু খৈল ছড়াইয়া দিয়া অল্প চাষ ও মই দিবে। তৎপর নাঙ্গল দিয়া একটি টান দিয়ে, টানের মধ্যে বীজরোপণ করিবে। এক এক চোকের এক একটি গাছ সুধার দা দ্বারা কাটিয়া রোপণ করিবে। বীজরোপিত হইলে দুই দিকের মাটি উঠাইয়া গাছের গোড়ায় দিবে। বীজ রোপণের ৩। ৪ দিন মধ্যে বৃষ্টি না হইলে সেচিয়া জল দিতে হইবে। ইহার পর গাছ গুলি লাগিয়া উঠিলে গোড়ায় তরল খৈল সার দিবে। এক একটি গোড়া হইতে ৩। ৪টির বেশী গাছ উঠিলে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। গাছের নিম্নে যে শুষ্ক পাতা থাকিবে তাহা ক্রমে ছিড়িয়া ফেলিবে। এবং কতক পাতা দিয়া ৩। ৪টি গাছ বান্ধিয়া দিবে। ইহাতে ঝড়ে গাছের অনিষ্ট করিতে পারে না। গাছ যাহাতে পড়িয়া না যায় তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে কারণ পড়া গাছে গুড় কম হইয়া থাকে।

ইক্ষু নানা প্রকার, তন্মধ্যে কাজলা, ধলি, বোম্বাই ও খাগড়ী সচরাচর এদেশে দৃষ্ট হয়।

ইক্ষু মারিবার জন্য দুই প্রকার কল এদেশে প্রচলিত;—এক প্রকার কেরখি অন্য প্রকার রূপ গাছা। ইক্ষুর উপরকার ছাল কতক ফেলিয়া কলে দিতে হয়, তাহাতেই পরিষ্কার রস

বাহির হয়। গুড় প্রস্তুতের প্রণালী প্রায় সকল দেশেই একরূপ। ইক্ষুর কৃষি বড়ই কষ্টকর। এই জন্য সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে——

বারছেলে তের নাতি।
তবেকর আঁকের ক্ষেতি॥

কলা।

কলার কৃষি, কৃষকের পক্ষে বড় উপকারী। কলার ফল, মোচা, ভাদাইল, খোলও পাত সকলই মূল্যবান। লোকে বলে, "রীতি মত কলা রুয়ে, থাক বাপু খাটে শুয়ে।" বাস্তবিক কলার কৃষি এই রূপই উপকারী। কলা নানা প্রকার,—সবরী, কবরী (জাইত) বর্ত্তমান, চাঁপা, চিনিচাঁপা, বোম্বাই, কানাই বাশী, অগ্নীশ্বর, আনাইজা, বিচা ও তুলা পাইজ।

কলা কৃষি সকল প্রকার মৃত্তিকায়ই হয়। নূতন কাটা মৃত্তিকায় কলা ভাল জন্মে। অনেকে বাড়ীর কয়ছীতে এবং ক্ষেত্রের বাতরেও কলা গাছ লাগাইয়া থাকে। এইরূপে যাহারা কলাগাছ লাগায় তাহাদের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা কিন্তু কলার কৃষি যাহারা রীতি মতন করিতে যায় তাহাদের জন্য এইরূপ প্রথাই ভাল। প্রথমতঃ কোদাল দ্বারাই হউক কি নাঙ্গল দ্বারাই হউক ক্ষেত্রের মৃত্তিকা একরূপ খনন করিবে। বৈশাখ মাসেই কলার ভেম বা বোক লাগাইতে হয় কলার ছোট ছোট চারার নাম ভেম বা বোক। ইহা কলার গাছের গুড়ি (আইঠা) হইতে উৎপন্ন হয়। শ্রাবণ মাসে কলা লাগাইলে সেই কলা ভাল হয় না।

কলার ডেম উঠাইয়া একদিন ছায়ায় রাখিয়া দিবে। পরে এক হাত অন্তরে এক হাত গর্ত্ত করিয়া কলা গাছ লাগাইবে। কলা লাগান সম্বন্ধে প্রবাদ এই:——

"আট হাত অন্তর, একহাত খাই।
কলা রোওগে চাষা ভাই॥
রুয়ে কলা না কাট্‌বে পাত।
তাইতে কাপড় তাইতে ভাত॥"

কলাগাছের মূলে চোক আছে ঐ চোক দক্ষিণ দিকে রাখিয়া পুতিলে মোচা সকলেরই উত্তরদিকে পড়িবে। গাছ রোপণ করিয়া যখন দেখিবে গাছ লাগিয়া উঠিয়াছে, তখন সকল গুলির মাথা এক সময়ে কাটিয়া দিবে। পরে নূতন মাইজ উঠিয়া গাছ সমান থাকিবে। তাহাতে কলা এক সময়ে হইবে এবং ২।১ দিন অগ্র পশ্চাৎ পাকিবে। গাছের গোড়া দিয়া যেসব ডেম উঠিবে তাহা স্থানান্তরিত করিবে বা কাটিয়া ফেলিবে, তাহাতে মূল গাছের কলা মোটা হয়। কলা গাছের গোড়ায় অন্ততঃ ২ বার মাটি খুঁড়িয়া দিবে। ইহাতে গাছ সতেজ হইয়া থাকে।

গোল আলু।

গোল আলুকে এতদ্দেশে বিলাতি আলু বলে। আয়র্লণ্ড হইতে আলুর বীজ প্রথমে এদেশে আইসে, এইজন্য এদেশে ইহার নাম বিলাতি আলু। দোয়াশ মৃত্তিকা গোল আলু উৎপাদনের বিষয়ে প্রশস্ত। এই আলুর ভূমি প্রতি মাসেই প্রায় চাষ করিয়া জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হয়। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে চষ

ও গোবর সার দিয়া চাস করতঃ মাটির সহিত মিশাইয়া দিবে। আলুর ক্ষেত্রের মৃত্তিকা রসযুক্ত থাকিলে আলু বড় হয় না। এই জন্য বিঘা প্রতি ৮/ মণ পরিমাণ ভস্ম দিবে। ভস্ম দিলে গাছে পোকা ধরে না। আলুর ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে নালা রাখিতে হয়। পূর্ব্ব পশ্চিম দিগ করিয়া সমস্ত ক্ষেত্রে কতকগুলি সাইর করিবে। সাইরের মধ্যে অর্দ্ধহস্ত ব্যবধান রাখিয়া ছোট ছোট আলু, যাহা পূর্ব্ব বৎসর বীজের জন্য রাখা হইয়াছে তাহা রোপণ করিবে। সাবধান থাকিবে যে, বীজের উপরে অধিক মৃত্তিকা না পড়ে। প্রতি বিঘা ভূমিতে ২॥ মণের বেশী বীজ রোপণ করিবে না। বীজ রোপিত হইলে প্রতিদিন অল্প অল্প জলের ছিটা দিবে। গাছ যেমন বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, তেমন গাছের গোড়ায় প্রয়োজন মতে মাটি খুঁড়িয়া দিবে। অনেকে কার্ত্তিক মাসেই আলু তুলিতে আরম্ভ করে। আলুর গাছ মরিতে আরম্ভ করিলেই সমস্ত আলু বাঁশের চটা দিয়া উঠাইবে। /৯ পোঁয়ার বেশী ওজনের গোল আলু আমরা দেখি নাই। উপযুক্ত পরিমাণে সার দিলে এক একটি আলুর পরিমাণ /২ সের পর্য্যন্তও হইতে পারে। ময়মনসিংহ জিলায় যে বিলাতি আলু জন্মে তাহা বড় ছোট। সার না দেওয়াই ইহার কারণ। এক বিঘা জমিতে ৫০/ মণ হইতে ১০০/ মণ পর্য্যন্ত আলু হইতে পারে।

ভেন্নাঁ।

ভেন্নাঁর অপর নাম রেড়ি। পূর্ব্ব বাঙ্গলায় ইহার আবাদ প্রায় দেখা যায় না। পতিত ভূমিতে বিঘা প্রতি ৪/ মণ গোবর দিয়া চৈত্র মাসে ভূমি ২।৩ চাষ দিয়া রাখিবে। বৈশাখ মাসের প্রথমে বীজ বপন করিবে। কেহ কেহ বীজ ছড়াইয়া দেয়। প্রতি বিঘায় /৩ সের বীজ হইলেই ভাল। গাছ উঠিলে গাছের গোড়ায় মাটি খুঁড়িয়া দিবে। ভেন্নাঁর দানায় তৈল জন্মে। ইহার তৈলকে রেড়ির তৈল কহে। ইহার খৈলও বেশ মূল্যবান। কৃষকগণ কাঁচা কাটিয়া যে আইল বান্ধে, তাহাতে বেশ ভেন্নাঁ জন্মে।

অরহর।

অরহরের ব্যবহার সকলেই জানেন। ভেন্নাঁর কৃষির সহিত ইহার কৃষির বেশ সম্বন্ধ। যেরূপভাবে ভেন্নাঁ জন্মাইতে হয়, অরহরও সেইরূপ করিয়া জন্মাইবে। এতদ্দেশে অরহরের চাষ আছে কিন্তু সার দেওয়া ব্যবহার নাই সুতরাং কেহ আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হয় না। চৈত্রমাসে গাছ কাটিয়া অরহর লইতে হয়।

কলাই।

কলাই নানাপ্রকার যথা:—মাষ কলাই, ঠাকুরী কলাই মুগ কলাই, মটর কলাই, খেসারী কলাই, বুট কলাই মসুর কলাই। পলি পড়া এঁটাল মৃত্তিকায় খেসারি কলাই

বেশ জন্মে। খেশারীর ক্ষেত্র চাষ করিবার প্রয়োজন নাই। মৃত্তিকা সরস থাকিতে বীজ ছড়াইয়া ফেলিলেই হয়। ধান্য কাটিয়া আনিয়া উক্ত ধান্যের নাঁড়া মধ্যেই খেশারি ছিটাইয়া ফেলিবে। ধান্য কাটার পূর্ব্বেই যদি দেখা যায় মাটি শুকাইয়া যায়, তবে ধান্য থাকিতেই ক্ষেত্রে খেশারির বীজ ছিটাইয়া দিবে। কার্ত্তিক মাসে বীজ বাইন করিবে। প্রতি বিঘায় ৫।৬ সের বীজ বাইন করিতে হয়। বাইন করার পূর্ব্ব দিন বীজগুলি ভিজাইয়া রাখিবে। তামাকের জলে বীজ ভিজাইয়া বাইন করিলে পোকায় ধরে না। গরুকে খাওয়াইবার জন্য অনেকে খেশারির আবাদ করিয়া থাকে। ইহা পাকিলে গাছ সহ উঠাইয়া আনিয়া ধান্য মলন দেওয়ার ন্যায় মলন দিয়া কলাই বাহির করিবে। মটর আবাদ প্রণালীও ঠিক ঐরূপ। মুগ, মাস কলাই প্রভৃতিও ঐরূপে জন্মে। কিন্তু চর ভূমিতে ইহা জন্মে ভাল। মুগ তিন প্রকার, সোণামুগ হাতী মুগ ও ঘাসি মুগ। সোণামুগ খাইতে ভাল। টাল ভূমিতেই মুগ উত্তম জন্মিয়া থাকে। মসুর দোয়াশ মাটি না হইলে জন্মে না। রসযুক্ত ক্ষেত্রে মসুর ভাল হয় না। ক্ষেত্রে ৮।৯ চাষ দিয়া কার্ত্তিক মাসে প্রতি বিঘায় /৪ সের পরিমাণ মসুর বাইন করিবে। মসুর ক্ষেত্রে কর্ষণের সময় গোবর দিবে। ঘুটিয়া ছাই বীজ মসুরের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাইন করিলে গাছে পোকা ধরে না। বাখরগঞ্জে ভাল মসুর জন্মিয়া থাকে। প্রতি বিঘায় ১৫/ হইতে ২০/ পর্য্যন্ত মসুর জন্মিয়া থাকে।

বুট—বুটের অপর নাম ছোলা অথবা চানা। বুট একরূপ সাদা—একরূপ লাল। এই উভয়েরই কর্ষণ প্রণালী একরূপ। দোয়াশ মৃত্তিকার মধ্যে যাহাতে বালুর ভাগ বেশী তাহাতে এবং

পললময় বালুচরে বুট ভালরূপ হয়। দোয়াশ মৃত্তিকায় বুট জন্মা-ইতে গোবর ও খৈল চূর্ণ সার দিতে হয়। ক্ষেত্রে ৮।৯ বার চাষ দিয়া প্রতি বিঘায় /৫ সেরের হিসাবে বীজ বুনিতে হয়। বীজ বুনিবার পূর্ব্বে হিরাকশ মিশ্রিত উষ্ণ জল বীজের উপর ছিটাইবে। বুটের গাছ বড় হইলে ডোগ ভাঙ্গিয়া দিবে ইহাতে দুইটি লাভ। ডোগা ভাঙ্গায় গাছে শাখা প্রশাখা বেশী জন্মিয়া ফল বেশী হয় এবং শাকগুলি বিক্রয় হয়। প্রতি বিঘা জমিতে ১৩।১৪ মণ বুট জন্মে।

বেগুণ।

বেগুণেরই অপর নাম বার্ত্তাকু। শীত ঋতুতে বেগুণ সুস্বাদু সুতরাং শ্রাবণ মাসে চারা করিয়া ভাদ্র মাসে ঐ চারা রোপণ করিবে। বৃষ্টির জলে দানা পচিবার আশঙ্কা এবং দানা পিপড়ায়ও খাইয়া ফেলে অতএব এক হাত পরিমাণ উচা মাচা করিয়া মাচার উপর চূর্ণ মাটি ও গোবরের সার বিছাইয়া দিবে। এবং তাহার মধ্যে দানা পুতিবে। বৃষ্টির জল বারণ জন্য একটী চালা করিয়াও দেওয়া কর্ত্তব্য। কাঁচা হরিদ্রা রসে দানা ভিজাইয়া পুতিবে তাহাতে গাছ পোকায় ধরিবে না।

ক্ষেত্রে ৯।১০ চাষ দিয়া মাটি খুব ফাস করিবে এবং তাহাতে গোবরের সার দিয়া সারি সারি করিয়া চারা পুতিবে। চারা পুতিবার সময় শিকরের অগ্রভাগ গুলি কাটিয়া দিবে তাহাতে শীঘ্র শীঘ্র ফল ধরে। চারা রোপণের পর সাত দিন জল দিবে এবং কলার খোল দিয়া ঢাকিয়া দিবে। গাছ লাগিয়া উঠিলে

গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া দিবে। গাছে পোকা ধরিলে হরিদ্রার গুড়া জলে মিশাইয়া গাছে ছিটাইয়া দিবে। গাছের মাথা কাটিয়া দিলে এবং অনেক ফুল হইলে কতক ফেলিয়া দিলে বেগুণ বড় হয়। আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে বেগুণ ধরিতে আরম্ভ হয়।

বেগুণ, ঝুমকী, লাফা, দুধিয়া মুক্তকেশী প্রভৃতি নানা নামে বিখ্যাত। চাষ প্রক্রিয়া সকলেরই একরূপ। উত্তমরূপে চাষ করিতে পারলে প্রতি বিঘায় শতেক টাকা লাভ হইতে পারে।

মূলা।

মূলার ক্ষেত্রের জন্য দোয়াঁশ মাটিই উপযোগী। গোবর, ছাই ও খৈল মূলার জন্য যোগ্য সার। মূলার ক্ষেত্র ধূলিবৎ হওয়া চাই। ক্ষেত্রের জঙ্গলাদি যাহাতে না থাকে তাহাই করিবে। প্রায় ১॥ হাত গভীর করিয়া চাষ করিবে। ২০।২২ চাষের কম মূলার ক্ষেত্র পাইট হয় না। এই জন্য চাষারা বলে, "শতেক চাষে মূলা"। মূলার মূল গাছের বীজ ভাল নহে। মূলার মাথা কাটিয়া কাদায় রোপণ করিয়া রাখিলে যে বীজ হয় তাহাই উপযুক্ত বীজ। বীজ ছড়াইয়া বুনে বা অন্যত্র চারা করিয়া ও ক্ষেত্রে লাগায়। অন্ততঃ আধহাত ব্যবধানে চারা লাগাইবে। গাছের গোড়ার মাটী খুব আলগা করিয়া দিবে। শীত কালের মূলা সুস্বাদু অতএব শীতের সময় যাহাতে মূলা হয় এইরূপ সময় বুঝিয়া লাগাইবে। এক বিঘা ভূমিতে ৬০।৬৫ টাকার মূলা হইতে পারে।

লঙ্কামরীচ।

ঝালের জন্য লোকে লঙ্কামরীচ ব্যবহার করে। এদেশে লঙ্কার ব্যবহার খুব বেশী। শুক্‌না ও কাঁচা দুই প্রকার লঙ্কা ব্যবহার হয়। ময়মনসিং, বগুড়া ও রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানে কাঁচা লঙ্কার ব্যবহার বেশী। চাটিগাঁ অঞ্চলের শুষ্কমরীচ এদেশে খুব ব্যবহার হয়। দোয়াঁশ মাটিতে লঙ্কার চাষ করিবে। লঙ্কার দানাতে ছাই মাখিয়া যে দানা, বীজের জন্য রাখা গিয়াছে, ঐ দানার অন্যত্র চারা করিয়া পরে সারি সারি করিয়া ক্ষেত্রে লাগাইতে হইবে। যেস্থানে সর্ব্বদা রৌদ্র লাগে এইরূপ স্থানে লঙ্কার চাষ করিবে। ছায়ায় লঙ্কার ঝাল হয়না। শ্রাবণ মাসের প্রথমেই লঙ্কার চারা রোপণ করিবে। চারা লাগিয়া উঠিলে গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া দিবে। গাছে পোকা ধরিলে ছাই ছিটাইয়া দিবে। অগ্রহায়ণ-মাসের শেষ হইলেই মরীচ পাকা আরম্ভ হয়। গাছে পাকা মরীচ রাখিবেনা। পাকা মরীচ রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ বেচিবার জন্য রাখিয়া দিবে। প্রতি বিঘা ভূমিতে ১৫।১৬ টাকার মরীচ জন্মিতে পারে।

মানকচু।

মানকচু দোয়াঁশ মাটিতে জন্মে। বাখরগঞ্জ এবং ২৪ পর-গণার মানকচুর চাষ আছে অন্যত্র বাড়ীর উপর কেহ কেহ লাগায় উহার আবাদ বারমাসই থাকে। মাঘ মাসে মানকচুর প্রধান সার ১গভীর করিয়া ১০।১২ বার কচুর ক্ষেত্র চাষ করিতে হয়। সারি করিয়া

কচু লাগান উচিত। কচুর গোড়ার মাটি খুড়িয়া দিবে। প্রতি বিঘা জমিতে শতেক টাকার কচু জন্মিতে পারে।

পেঁয়াজ।

পেঁয়াজ ও একটি প্রধান কৃষি। পেঁয়াজ বড় ও ছোট দুই ভাগে বিভক্ত। পলল ময় মৃত্তিকায় বেশ পেঁয়াজ হয়। ছোট পেঁয়াজ লাগাইলেই গোড়ায় পেঁয়াজ জন্মে কিন্তু বড় পেঁয়াজের তাহা হয় না। বড় পেঁয়াজের দানা লাগাইতে হয়। প্রতি বিঘা ভূমিতে প্রায় ৫০ টাকার পেঁয়াজ জন্মিতে পারে।

জলকচু।

জলাকৃ দল দলিয়া মাটি জলকচুর উপযোগী। গাছের গুড়িতে যে ছোট চারা থাকে তাহা লাগাইতে হয়। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে চারা লাগাইবে। বর্ষার জল আসিয়া যখন গাছ ডুবাইবে, তখন গাছ জলের উপর ভাসাইয়া রাখিবে, তাহাতেই কচুর মূল অংশ বৃদ্ধি পাইবে। জলকচু নানা প্রকার তন্মধ্যে নারিকেলি ও দেশী এই দুই রকম আমরা দেখিয়াছি।

বাঁক।

বাঁকের অপর নাম ওল। দোয়াশ মৃত্তিকায় ওল জন্মে কিন্তু জল ডুবা স্থানে হয় না। ওলের গাছ আশ্বিন মাসেই মরিতে থাকে, তখন ওল উঠাইতে আরম্ভ করিবে। বাখরগঞ্জে রীতি

মত ওলের চাষ আছে। পূর্ব্ব বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানে আপনা-আপনি পালান প্রভৃতিতে ওল জন্মিয়া থাকে।

মাথৈ।

মাথৈর অপর নাম ভুট্টা। পার্ব্বত্য দেশে মাথৈ জন্মে। গোবর ও খৈল মাথৈ ভূমির সা'র। সার ক্ষেত্রে দিয়া ৪।৫ চাষ দিবে পরে আইল বান্ধিয়া ২।৩টি করিয়া দানা এক এক স্থানে পুতিবে। বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাসে দানা পুতিবে। বীজ বপনের পর প্রায় ৩ মাসের মধ্যেই ফল ফলিয়া থাকে। মাথৈ এতদ্দেশে বড় ব্যবহারে আইসে না।

তরকারী।

তরকারী নানাপ্রকার। লাউ, কোমরা, বেগুণ, শশা, ডাঙ্গা, বরবটী, ছিমর, কাঁকরুল, পোটল, ঝিঙ্গা প্রভৃতি সকলই তরকারী। আপামর সাধারণ লোকেই ইহার বীজ রাখা ও বীজ বপনের প্রথা অবগত আছেন। সুতরাং ইহার সম্বন্ধে ২।৪টি জ্ঞাতব্য কথা মাত্র লিখিলেই যথেষ্ট। কৃষক মাত্রেরই কেন গৃহস্থ সমস্তেরই তরকারী আবাদে মনোযোগী হওয়া উচিত। তরকারীর জন্য সামান্য অর্থ যায়না। একটুক মনোযোগী হইলেই আপন বাড়ীতে সমস্ত তরকারী জন্মান যাইতে পারে। বেগুণ, মানকচু, জলকচু, ওল প্রভৃতিও তরকারী, তাহার বিবরণ আমরা এই অধ্যায়েই লিখিয়াছি। এই সব ভিন্ন অন্য যেসব তরকারীর নাম আমরা "তরকারী" শিরোনামদিয়া লিখিলাম ইহা প্রায়ই বর্ষা কৃষি।

বর্ষার তরকারী হেমন্তে লাগাইলেও বেশ হয় কিন্তু সুস্বাদু ও ভাল হয়না। অতএব বর্ষার তরকারী বর্ষায়, হেমন্তের তরকারী হেমন্তে লাগাইবে। ছিম তরকারীর দানা চুনের জলে ভিজাইয়া লাগাইলে ছিমে পোকা ধরেনা। ছিমের দানার একরূপ দাইল হয়। উহা ত্রিপুরা জিলায় খুব ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মিষ্ট কুমরকে কোন কোন স্থানে বিলাতি কহে। মিষ্ট কোমরের এই উচ্চ সম্মান কেন, তাহার কোন তাৎপর্য্য আমরা বুঝিনা। ইহার গাছ লতাজাতীয়। গাছ অত্যন্ত দামিয়া গেলে ফল ধরেনা। তজ্জন্য গাছের চারিদিগের কিছু সিপা আলগা করিয়া দিবে। বিলাতির গাছে প্রথম২ যে ফুল হয় তাহার গুড়িতে ফল থাকেনা বলিয়া অনেকে তাহা ছিড়িয়া লইয়া তরকারীরূপে ব্যবহার করে। ইহা অন্যায়, কারণ ঐ ফুল গুলি পুংজাতীয়। এই ফুলের পুংকেশর দ্বারা ফুল ফলে অতএব ঐ পুষ্প নষ্ট করা উচিত নহে।

লাউকে কোন কোন স্থানে দেশীলাউ কহে। লাউগাছের গুড়িতে গোবর সার ও পানা দিবে, ইহাতে গাছের তেজ হয়। এই লাউ গাছ পাগারের মুড়িতে ভাল জন্মে। এই লাউগাছ ঝাকার উপর বাহিয়া যাইতে পারিলে ফল ফলে উত্তম।

সম্পূর্ণ।